নির্বাচিত কবিতা

নির্বাচিত কবিতা

কাজল কানন

নবান্ন প্রকাশনী

নবান্ন : ৭৯

নির্বাচিত কবিতা
কাজল কানন

নির্বাহী পরিচালক : নূর নাহিয়ান
প্রকাশক : সাহেলী তাসিমা ফিরদৌস, নবান্ন প্রকাশনী
১২ বাংলাবাজার, সিকদার ম্যানসন (নিচ তলা), ঢাকা-১১০০
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : অমল আকাশ
বর্ণবিন্যাস : মো. সফিকুল ইসলাম
মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টার্স, ৩৬ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০
মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

Ischer Daana
by Khalil Ahmed
Executive Director: Noor Nahian
Published by Shaheli Tasima Firdous, Nobanno Prokashoni,
Dhaka-1100
Price : 300.00 BDT Only (US $9.00)

ISBN : 978-984-98049-5-6

অনলাইনে পাওয়া যাবে : www.rokomari.com

উৎসর্গ

জোনায়েদ আহমদ

ভূমিকা না দিয়ে

কবিতাগুলো আমার না- আমার মধ্যে ভর করে জারি হয়েছে হয়তোবা। হতে পারে এগুলো আমাদের কবিতা। আবার তাও না হতে পারে। এখানে সমবেত সবইতো এই জনপদ থেকে তুলে দেয়া। এখানে, এই প্রাণপ্রকৃতিতে যা আছে, তার একটা বাদ্যি হতে পারে এসব।

এ যাবত যে সাতটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার বাইরে কিছু অগ্রন্থিত মিলে এই সারণি। তাকে নির্বাচিত, স্বনির্বাচিত, সংকলন যে নামেই ডাকি- কাজ কিন্তু আগেরটাই; সে যা হয়েছে, তা-ই।

এখানে আমাদের এই কবিতারা কেউ রাজরাণী, কেউ পাড়াবেড়ানি হয়েছে হয়তোবা। কেউ যেতে চেয়েছে বিচিত্রে আবার হয়তো হয়েছে বিপথগামী। তবুও একটা কিছু বলবো তাকে। যেভাবে আম্মাকে আব্বাকে বলি আমরা। অকাট্যভাবে বলা। হিতের সঙ্গে, হিম্মতের সঙ্গে বলা।

তো, কবিতার কাছে যা চাই, তার প্রায় সবটাই পেয়ে বসেছি। এতো এতো নিয়েছে আর দিয়েছে সে, কোনো কমতি রাখেনি যে।

কাজল কানন
জানুয়ারি ২০২৪
নারায়ণগঞ্জ

সূচিপত্র

মাটির মড়মড় ১৩–১৮

পাতারা জেনে যায় ১৩
নদীও নারীর ১৩
শাড়ি ১৪
সত্য, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার ১৫
অনূঢ়া যখন প্রথম ওড়ে ১৫
শিরায় শিরায় কান্না ১৬
দীর্ঘশ্বাসের ফুল ১৬
নদী আমার কাঠালিয়া পত্র লেখে স্রোতস্বিয়া ১৭
উচ্চারণ ১৮

পইখ ওড়ে যাও ১৯–২৪

পালকে পালকে ছেয়ে গেছে ঘর ২৫–৪৪

সাধনা ২৫
হন্তারক ২৫
একদিনের বাবা ২৬
নদী ২৬
লুচেন সাংমা ২৭
তত্ত্ব ২৭
প্রেমের কবিতা ২৮
নির্জন দুপুর ২৮
মুক্তিযুদ্ধের কবিতা ২৯
তারাবাতির অতিথি আলোর রূপসী স্টেশনে ৩০
হারানো বিজ্ঞপ্তি ৩০
নির্জন স্কুল ৩১
লক্ষ্য উদ্দেশ্য ৩১

পোশাকশ্রমিক চরণে ৩২
হেমন্তের স্টেশনে ৩৩
উরোগামী পথ ৩৩
একজন জুনাবালি ৩৪
লাইবুড়ানী ৩৪
বসন্ত দাসের মরামেয়ে গ্রামে আসে পূর্ণিমা হয়ে ৩৫
স্বপ্নে বাড়িফেরা ৩৬
সম্পর্কশাস্ত্র ০৫ ৩৬
মরিয়মনামা ৩৭

তোমার মধ্যে আমি কে ৪৫–৬২

কীটদষ্ট জল ৬৩–৭২

আমি ৬৩
বিপুল বাসনা আমার ভেসে যায় দূরে ৬৩
পলায়ন ৬৪
যাও পাখি বলো তারে ৬৪
পাহাড় আছে পাহাড়ির কাছে ৬৫
ঋতু চুরি ৬৭
মেঘপত্র ৬৮
ভুবনের চোখে অশ্রু দুইফোঁটা ৬৮
বিনাশী চাঁদের আলো ডেকে যায় ৬৯
বাংলাদেশ ২০১৪ ৬৯
মন্দিরা ৭০
সনাতন বটতলা ৭০
আয়না ০২ ৭১
যতির কাছে হেরে যায় গতি ৭১

পাতার কোলাহল ৭৩–৮২

আমাদের ছেলেবেলা ৭৩
আম্মা চিল হয়ে যেতে পারতেন ৭৩
সহমরণে নাই ৭৫
সর্বপ্রাণ ৭৫
প্রকল্প ৭৫

ফিদেল ৭৬
বোধোদয় ৭৬
দাউ দাউ করে জ্বলছেন যিনি ৭৭
স্বপ্নবধের বিদ্যা ৭৭
উন্নয়ন প্রসূত চমকের দিকে ৭৮
বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ৭৯
বাইচ ৭৯
জল্লাদের পরিপত্র ৮০
ভবে মোর দেহতরী ৮০
জীবনব্যাপিয়া বাঁচো ৮১
চোতা ৮১
শীতমাসে ৮২

করি দেহে গাছ চাষ ৮৩–১০৩

মায়া ০২ ৮৩
ব্যথা ও মার্কস ৮৩
লেনিন ধান কমরেড ধান ৮৪
নাগরিকপঞ্জি ৮৪
ইলিশ ৮৫
উৎপাদন প্রণালি ৮৬
জবানবন্দি ৮৬
ক্রমবিকাশ ৮৭
যে রাতে পাকুড় কাঁদে ৮৮
ডুমুরগাছ ৮৯
লকডাউন ৮৯
করমর্দন ৯০
ভাত ৯০
মৃত্যু ৯১
লুৎফার মা ৯২
হবুমানুষ ৯৩
ত্রাণ ৯৩
বন্দনা ৯৪
অগ্রন্থিত ৯৫

মানুষ বেহাত ৯৫
মুদ্রা ও ক্ষুধার জাগরণ ৯৬
আমার ডান দুঃখ ৯৬
শান্তিদির বোন ৯৭
দুর্দান্ত কবিতা ৯৮
ধনকুবেরের শিশ্নকাণ্ড ৯৮
সাহানা ৯৯
শ্রমিক ৯৯
কবি ও রাজনীতি ১০০
সুগন্ধবিলাস ১০০
হানা ১০১
দুঃখসরোবর ১০২
বর্ষা দেখা ১০২

পাতারা জেনে যায়

মাছরাঙার সঙ্গম দেখতে যাবোই আমি
যেমনই হোক রাষ্ট্রের তদন্ত রিপোর্ট
সাদাকাগজে লেখা একটা কুকুরের ঘেউ
আকাঙ্ক্ষার চেয়ে রক্তাক্ত যে কেউ
পথবাসে ব্যাপ্ত হলে–
রুখে দেবো কূটনৈতিক পাসপোর্ট।

পাতারা স্বভাবতই জেনে যায়
সঙ্গমেও কারা মুদ্রা জড়ায়
গণমাধ্যম নিয়ে যে প্রশ্ন বিক্ষোভে যায়
তাকেও ফিরে আসতে দেখি-
হালের তারকা রূপে
পাতারা ব্যাপক জেনে যায়
বিক্ষোভের আগেও হাঁটে অমানুষের চোখ
কোন্ কারণে লাল হয় কূটনৈতিক পাসপোর্ট
মুদ্রাজ্বরে তারও একটা রক্তাক্ত তদন্ত হোক
মাছরাঙার সঙ্গম দেখতে যাবোই আমি
সঙ্গে যাবে আমার দৃঢ় পদছাপ

নদীও নারীর

দেখেছি নদীটি, নদীর ভেতর কাঁপছে কালের মুখ
দেখেছি মুখটি, মুখের ভাঙা জমিন ভিজছে জলে
ঠাণ্ডা হয়েছে ঘরের মানুষ, মরেছে চোখের রেণু
দেখিনি নারীটি একাই এসেছে নদীতে অস্ত যেতে!

মাছেরা নদীর কুলীন বংশ, নদীর আদিম পিতা
স্তরে স্তরে রঙ্গ করছে, ছুঁড়ছে জলের রূপা

নারীটি তখনো ছুড়েনি জীবন, ভিজছে স্থির ঘামে।
দেখিনি নারীটি একাই এসেছে নদীতে অস্ত যেতে!

শব্দ সমূলে ভেঙে পড়ছে মুগ্ধ ভাবের ফুল
শঙ্কাতাড়িত গাট্টি-বোঁচকা, স্মৃতি-গল্পে ভরা
তবুও জীবন, জননে মেতেছে একটি বিষের ফোঁড়া
বর্ষারাতের ঝড়-চঞ্চল আকাশ তুলেছে হাঁক
বিবেকে মড়ক, ব্যক্তি কোথায়? বংশ ভিজছে শীতে
চোয়ালে জখম ঢাকতে চাইছে পাঠাভ্যাসে বসে!
নদীও নারীর, নারীও নদীর অন্তরঙ্গ ঢেউ
কার কাছে কে ঠাঁই নিয়েছে অমোঘ জলের ঘোর

শাড়ি

একটা উঁচু দরের শাড়ি চাই
ঠুনকো অর্থে নয়, ব্যাপক অর্থেই শাড়িটা আমার দরকার।
খাস সেলাইবুনট; নিজের রক্তে রক্তে হোক;
আয়নাখচিত, শিল্পমূল্য আকাশছোঁয়া
সুতোয় সুতোয় হরিণের ছবি; রঙে ভ্যানগঘ কিংবা
গভীর অরণ্যকে অনুসরণ করা যেতে পারে।
টেকসই সক্রেটিস বা লালনের কাছাকাছি হলে
আপত্তি নেই; অন্তত একমানুষ সমান চাই।
দৈর্ঘ্যে- পাখির ঘুমের সমান, প্রস্থে- শিশুর চিৎকার যতটুকু হয়।

তাত্ত্বিক দ্বারা যাচাইকৃত শাড়িটার বাজারমূল্য হবে–
পৃথিবীর একদিনের ক্ষুধার সমান কিংবা বোকার
কাঙ্ক্ষিত বুদ্ধির সমান।
শাড়িতে লতাপাতা আঁকা হলে অবশ্যই বাংলাদেশের
অতি দরকারী– লাউ, শিম ইত্যাদি গুরুত্ব পাবে।
আমার মাটির জন্য দরকারী শাড়িটিতে
বাঙলার শালদুধ সংরক্ষিত হবে

সত্য, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার

এই অপেক্ষার কোনোই তাৎপর্য নেই– মৃত, অবিস্মরণীয়
আমি যে বেঁচেছিলাম একথা সত্য হতে পারতো
যত সত্য তোমাদের ভৌতিক সংসার
এতো এতো কসম যে খাচ্ছো
একটি কসম যদি তোমাকে খায়? একলা. সন্ধ্যায়
ঈদের ছুটিতে কিংবা বিছানায়, টানটান মাচার উপরে!
সাধারণ মৌনাচারে লতিয়ে উঠে সন্ত্রাস
মানুষের অন্তরঙ্গ অন্ধকার তোমাকে এই কথা বলেনি!
দু'টি ভেজাচোখ আর চূড়ান্ত মৌনাচারের অভিজ্ঞতা
একাডেমিক মানুষের কাছে তাৎপর্যহীন মেধার বয়ান দিয়ে যাবে।
কিংবা তুমিও ছাব্বিশ পয়েন্ট বোল্ডে লিখে যাবে
অসতর্ক সততার পাহাড়!

অনূঢ়া যখন প্রথম ওড়ে

উৎসবের সমস্ত মূল্যের শেষে–
ওর ঘরের দরোজার খিল খোলা হবে আজ
পূর্ণপ্রায় চাঁদ ঘরের চারদিক হেঁটে হেঁটে, শিস
দিয়ে সবটুকু নিরবতা খেয়ে নেবে অবসরে

এতগুলো দিন, এতোগুলো রাত অস্ফুট ছিলো
চুলের ঘ্রাণ, যৌবনের স্পর্ধা!
আজ তারা শতশত পাখি হয়ে আকাশে উড়ে উড়ে
উড়াবে মানুষী সমগ্রতা।

আয়না এসেছে, ওকে দেখবে এবার চুপচাপ
শরীরের ভেতর খেলা করে হাজার হাজার রঙিন জোনাক
অন্য এক ঘ্রাণের ভেতর, রসের ভেতর উচ্ছল প্রস্তুতি
কি যেনো বলে দিতে চায় শরীরকে ডেকে!
শাড়ির এতোবেশি ঝাকুনি, ব্লাউজের থতমত শিহরণ
নখের লাল রঙের ভেতর জীবনের সমস্ত প্রস্তুতি দেখে

দেখে, সেইসঙ্গে মায়ের তামাটে স্তনের বোঁটা, গরুর কাঁধে
জোয়ালের দাগ, বাবার ঘাড়ে লাঙ্গল সওয়ারের উজ্জ্বল চিহ্ন
স্পষ্ট হয়ে– প্রকাশের আগে, তার মাতৃনির্মাণ, পিতৃনির্মাণ
ভেঙে ফেলার আগে; গলার হারের ভেতর, কানের ঝুমকার
ভেতর সমস্ত তামাটে মানুষ একসঙ্গে জ্বলে জ্বলে ওঠে!

ওর চোখের ওপর এখন শুধুই সময়ের শরীরি ডাক
মানুষের অন্যএক দ্বিরতি আবাদ
শরীর ডাক পাঠায় রক্তে
প্রকাশিত হয় সব গাছ সব পাতার প্রকাশ্যে!

শিরায় শিরায় কান্না

আপাকে বলছে অন্ত- 'তোমার ঠিকানা ভিজছে দেখো।'
আপাটি তখনো সেলাই করছে জামার বোতামঘর
সুতোর চাকতি, ভাঙা ব্লেড, কাঁপা আঙুলের গিঁট
চালের ছায়াটা ধীর ধীরে হেলে পড়ছে সূঁচের মুখে।
শো-কেসের তাকে– বিভূতি, শরৎ, ডায়াবেটিসের বই
বেতের চেয়ার, ছেঁড়া স্যান্ডেল, মায়ের বিয়ের ছবি।

'অন্ত তোমার বয়স হয়নি,' বয়স একটা ব্যাপার বটে
নিরবে জন্ম শুকিয়েছে যারা, তারাই কেবল জানে
ঠিকানার সঙ্গে বয়সও কালে ভিজতে ভিজতে বাড়ে।
যাগ্‌গে ওসব, লোকে বলে- নীরবতাই নারীকর্ম
-'বুঝলে অন্ত, সেলাইকর্ম বয়সের মতো ধীর,
নারীকর্মতো শিরায় শিরায় ঐতিহাসিক কান্না

দীর্ঘশ্বাসের ফুল

চাঁদগলা আকাশ; উদোম কবর, রাত্রি ঘুমোয়, ঘাসের মুখে জেগে থাকে
শিশিরের স্তন! নিরবতা চুরমার ক'রে বুনোপাতার পিপাসা পান করে ক্ষুধার্ত
কুকুর– তার পেটেই বড়ো হচ্ছো তুমি– দীর্ঘশ্বাসের ফুল!
বিস্তীর্ণ বনভূমে আজ রাতেই ভেঙেছে এমন কোনো পাতা কিংবা পাতার

জন্মধ্বনি– সময়ের পাঠক! প্রিয় আস্থাগুলো দাঁড়াশের দাঁতের মতো পাতার
অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে!
এক দ্বিপদীর চোখ– লোকচোখের আড়ালে ভেতরে ভেতরে খুঁজে চলে–
অরণ্যের সুগন্ধি হাত, শস্যপ্রবণ শেকলগত হাত। দৃষ্টিমূল্যে প্রসারিত শোকের
অন্তর মন্থন ক'রে, পাখির ঘুমের মতো মুখ যার- স্তন্যদান করে রাতের
পৃথিবীরে!
ঐ মুখাকার ঘিরে, সতর্ক পাখিদের উত্তেজিত ফেনায় জ্ব'লে জ্ব'লে যায় জলে,
মনুষ্য পীড়া।

নদী আমার কাঠালিয়া পত্র লেখে স্রোতস্বিয়া

প্রদোষে পত্র আসে, ফুরফুরে হাওয়ায় লেখা–
পরসমাচার এই যে, একটা সৃজনশীল উঠতি পাঙাস
নি:সঙ্গ হয়ে পড়লে, আমরা কেউ ভালো নেই; একথা
বৃষ্টি হলে যেমন, রৌদ্রোজ্জ্বলেও তেমনই নতুন।
স্রোতের নতুনত্বে দমকা হাওয়া, বিহবল ঢেউ–
নিজের সঙ্গে নিজের সামলে থাকা দুরূহ!

আমার দুই পুত্র-কন্যা, রুহিতা ও মধুঘোপি এক দেহের দুই ডানা
মধুঘোপি আমার আশ্রয় থেকে, ওপারচর, বিজয়নগরসহ
একুশটি গ্রামের ভরসারানী; চৈত্রে ও আষাঢ়ে স্থিও, শান্তধারায়
নিজেকে নিয়ে যায় মাঠের কৃষিতে।
রুহিতার কথাতো জানোই্‌ বর্ষায় রাগী, চৈত্রে রুগ্ন, অসুখী।
তাকে নিয়েই আমার ভয় ভয়ংকর!

এভাবেই আমাদের প্রাত্যহিকী,
ডুবুচরে তরঙ্গমালা রৌদ্দুরে চিকচিক করে আর
পেট ভাসিয়ে বোয়ালের ঝাক উজান যাত্রা করে– তুমি এসো!
নাইওরি নাওয়ের থেকে কান্না এসে আছড়ে পড়ে জলে, আফাল ওঠে!
বৈশাখ পনেরো হলে মোহনপুর ভাটিচর থেকে জলের ঝাঁক
উজানে উঠতে থাকে, আমরা অপেক্ষা করি।
পরেশ কৈবর্তের স্ত্রী মাধবী রাণীর পেটে জোয়ার এসেছে, ফুলে
উঠছে– জৈষ্ঠিমাসের ট্যাংরা-পুটির মতন!

মাধবী জল নিতে আসে গ্রামের উত্তরে–
তার সুবিধার কথা ভেবে নদী এবার মোড় নিয়েছে ক্ষানিক দক্ষিণে
কাঠপট্টির হাট থেকে দলে দলে মাটি নেমে পড়েছে কাঁঠালিয়ায়
লোকে তাকেই ভাঙন বলে!
এসব আমি তোমাকে লিখতে চাইনি, তুমি সবই জানতে। তবুও...!

নদী আমার কাঠালিয়া,
আমি কি এও জানতাম- তোমার একটা প্রাণ আমার চরায় উঠে
বুকের অলিন্দে ঘুণাক্ষরে লিখেছিল– নির্বাসন

উচ্চারণ

বিদায় জোনাকি পোকা, বিদায় মনের ঝোঁপে চুপটি মেরে থাকা বাংলাদেশ!
হাড়ের ঘর, তালুবন্দি মাটি, উত্তাল রাতের শেষে শিকড়ে শিকড়ে তোমার
সঙ্গে চৌচির হবো বেশ। টিনের চালে বৃষ্টি, সারাদিন শিমের পাতার সঙ্গে
মনের ভাব মিশে যায় সমুদ্রে। তাকে নাকাল ক'রে বিদায়! ঘন রোদ; বুকপুর
কুড়কুড় দখল নেয় বৈচামাছের চচ্চরি, তার ঢেকুর বাতাসে ঘুরে আসে
গানের নাম। বিদায় সঙ্গীত! তালতলার লাল বাছুর, লালু! বিলের শ্যাওলায়
চাঁদকুড়ো, চোখ তার ঠিকড়ে বেরোয় পালোয়ান শতশত। বিদায় ছোটকাগজ!
হায় মনের উক্তি খেয়ে খয়ে যায় ধীরে, মমতায়।

রাতের ঝর্ণা, নেবে-রে আমাকে? এই মধ্যদুপুরে, যৌবনের সর কেটে--
নদীটার থেকে আরও অবসরহীন, উদার; মানুষের খোসা থেকে মুক্ত করে।
বৃক্ষের দায় মাথায় নিয়ে তোমাকেও স্মরণ করি– ত্রুটিগুলো তুলে রেখো
পৃষ্ঠায়; খাদ নেই, ক্লান্তি নেই ওইব ছেলেমানুষিগুলো আর আমাদের
স্বপ্নদেখার সেই সব চোখ– যার থেকে দূরে অতি সাবধানে আমরা বাস
করবো নিভৃতে; সকলের আদিতে মানুষের প্রথম পূর্ণিমার মতো কৌতূহলী
পরস্পর।
বিদায় জোনাকি পোকা, বিদায় মনের ঝোঁপে চুপটি মেরে থাকা বাংলাদেশ!

মাটির মড়মড়, প্রথম প্রকাশ ২০০৩, প্রচ্ছদঃ লাকী ওসমান

০১
এখনই বৃষ্টি হবে। হাত ধরাধরি করে থাকো
চোখের পলকে ভিজে যাবে মাটি, বাসনা তোমার।
নিরন্তর চারাগাছ উত্থিত দৃষ্টির সীমানায় দৃশ্যমান
সাদাকালো আত্মঘাতি ছড়িয়ে চোখের চারপাশে
জননে ক্লান্তপরিজন, যারা বিশ্বাস রেখেছে আগুনে
যৌবনের মধুরতর বিন্যাসে ভেজা ফরাশের মতো
অবিরাম আয়ুষ্কাল তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে
নিরন্তর বিরহের বনে, যেখানে ঝওে পড়ে মানুষ
আর জেগে উঠে নগর মহানগরজুড়ে স্মৃতি বাগান
মনোরম সেই বনের ভেতর আলো-অন্ধকার ধরে
দেখবে মাতৃবীজ ফেটে পড়বে উদ্ভ্রান্ত চোখের কাছে

০৭

কিছুই না হোক তোমার
চুপমেরে থাকা সকালবেলা গভীর রোদনের ভেতর নামতা পড়ো
ব্যর্থ মিশন পার হয়ে সন্ধ্যাবেলা বুকের ভেতর থেকে ডেকেওঠা
রক্তবীজ; স্মৃতি হরণিয়া হাওয়ার সঙ্গে বিফল বাঁশুরি বাজিয়ে সে
কতদূর যাবে, তুমি জানো না। জানো না বলেই এই বিয়োগের
রাত সৃষ্টি হয় পৃথিবীর ফুসফুসে; তোমার কিছু করার নাই ভবে
একটি পাথর তুলে আরেকটি পাথর তুলতে থাকাই তোমার কাজ
আর সব ভুলে যাও, এমনকি আপন মুখমণ্ডলও ভুলে যাও তুমি
পাবে তারে, যে আর কোথাও নেই, কোথাও নেই তার অন্তর
মাথাকাটা মাছের শরীরে ঢুকে বসো; তোমার চিন্তা থাকবে না
ব্যথাও না। বিশ্বাস করো তুমি প্রত্যাহার করেছো হৃদয়, গান ।
কোনো আলোড়ন থেকে ডাক এসে পৌঁছবে না হৃদয়ে আর
এই করে সাধনার একটা কাল তুমি কাটামাথা মাছের ভেতর
থাকো। আর থাকো ভালোবাসা বুকে করে, এমন এক উদ্যান
কামনা করো, যেখানে কখনো লোক-আলো পৌঁছুতে পারেনি
আর বসে থাকো যেনো সন্ন্যাসী পিঁপড়ে; যদি ডাকো কোনো

নাম ধরে, সে তোমারই নাম– যে গেছে নিজের শরীরে ডুবে
তথাপি আলোড়ন থামবে না দুনিয়ার, থামবে না তুমিও আর

০৯

যদি ছেড়ে যাই ধানক্ষেত, তিনকোণা জলাধার ও মৌন রক্তপাত
এক গোপন সরোবরের সন্ধান আমি পাবো, যেখানে আরম্ভ এই
নিরন্তর প্রাত্যহিকীর। সহস্র বছর ধরে হেঁটে চলা এক পরিব্রাজক
তার হৃদয়ের কুষ্ঠি খুলে আমাকে দেখাবে হয়তো নিয়তির খেলা!
তবেই কি আমার আত্মা রঙিন হয়ে উঠবে! পাবো কি তার দেখা
আমার পিতামহ যা দেখেছিলেন বিস্ময়ে! তার ফেলে যাওয়া সুখ
আমাকে দেবে সেই আদিমতা; যা তার সর্বমনে ছিলো বিস্তারিত!
আমি আমার সময়ের কাছে, তার নিরন্তর চলাচলের আবেগবদ্ধ
কাল প্রত্যাশা করেছি বহুবার, কিন্তু হৃদয়ের পথেই ফিরে এসেছি
দিগন্তজোড়া স্বপ্ন আর এক প্রকার বিশ্বাস নিয়ে এখনো রয়েছি
তাতে কোনো জয় নেই, পরাজয় নেই, আছে এক প্রকার জড়তা
যে জড়তায় শুয়ে শুয়ে কবরবাসীর মতো অন্যের প্রার্থনায় চেয়ে
থাকা; এসবের পরও বৃষ্টি হয় আমাদের গ্রহে, জমে জন্মপ্রক্রিয়া
তার আবার সেই কোলাহল, বিধিবদ্ধ রাস্তার পর রাস্তায় চলাচল
এতেই আমাদের হৃদয় বহু রঙিন! কারো যেনো চাওয়ার নেই,
নেই কোনো নতুন প্রার্থনা আর। এর মধ্যেই হৃদয়ের বয়স বাড়ে
চারপাশে ছড়িয়ে যার যার গোপন সরোবর, ব্যক্তিগত সভ্যতা!

১২

মায়া তোমার কথা মনেপড়ে
এক আলুলায়িত বাঁশঝাড়ে রাতের শাদা আলোর মতো তোমার মুখ বলকায়;
সম্ভবত এক দেশ আছে মায়া, যেখানে আমরা সকলেই অনির্ধারিত বেদনা
আমাদের হৃদয়ে পুঁতে রাখি আর একটা সমানতালের বাজনা বাজে মনে! না
হয়
কেনো আমাদের মনেপড়ে? কেনো জড়িয়ে যাই ঘোর পাকিয়ে! কী এমন
হয় সকলেরই সমান চোখ না থাকলে! মনে হয় মাথার ভেতর আরো এক
সভ্যতা– রাতের মতো ঝিঁঝিঁরত দ্বীপ; হয় তার চোখ নাই কোনো হৃদয়ে

দ্যাখে, নয় সে বধির পক্ষির অধরে নাচে; জ্বলেপুড়ে ছারখার ক'রে, মাঠে
ফাটলরেখা ছড়িয়ে দ্যায়, খরাকাতর কৃষক যিনি, যার কন্যাদায়ে পুত্রদায়ে
গোপন
চাহিদাপত্র রোপিত তারই মাথার ভেতর রাতের মতো ঝিঁঝিঁরত দ্বীপ বিস্ফারিত
আর স্বপ্নময়!

১৪

পাশবালিশে তোমার মনোরম শরীর পড়ে আছে
মাথার ভেতরে দূর আলোকিত দিনের স্মৃতি
সময় যাচ্ছে, যেভাবে হৃদয় শাসন করে রক্তশিরা!
দীর্ঘপথ ধরে হেঁটে কিছুটা স্বপ্নের ভেতর আর
তোমার প্রাণান্ত ভালোবাসার আলোড়িত শহরে
এক অন্ধকার সময়ের প্রেরণা বেঁচে আছে
তোমাকে পেলো না তারা, যারা গান করেছে
নিরন্তর; ব্যক্তিগত প্রেরণায় যার অন্তর বেঁচে আছে
তার মৃত্যু কোথায়! পৃথিবীর ভেতরে পৃথিবী রয়েছে
থাকে সব মানুষেরই চোখের প্রতিক্রিয়া
তোমার সারাদিন শুয়ে থাকা, এ কীসের উত্থান!
কোন্ অন্তহীন যাত্রার অভিলাষে এখানে ঝরছে
বিষের গোধূলি!

১৭

ঝাঁকের পইখ ঝাঁকে ফিরেছো
আমি পেয়ে গেছি দাঁড়িয়ে থাকার মনোদৈহিক ঐতিহ্য
নতুন নতুন যাত্রাপর্বে ঝাঁকের পইখ ঝাঁকে উড়ে যাও
তন্দ্রাবিলাস ভেঙে জেগে উঠে আধখান সময়
আধখান ছায়া!
তুমি যাত্রা করো গাছে গাছে পাখিচক্র তছনছ করে
ত্রিমুখি রাস্তার মতো ছড়িয়ে পড়ো বিবিধ গ্রাম ধরে
রাজকীয় একাকীত্ব শেষে তর্জনী ধরে উঠে আসো
বিস্মৃত ঐতিহ্যের শিশু!

তোমাদের প্রস্থান মূলত তার্কিকের ইন্দ্রিয় দিয়ে।
যদিও মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে আত্মাকে মৌন করে
তার গভীর থেকে উঠে আসছে নি:সঙ্গ স্মৃতিবদল
উড়ে যাওয়া ঝাঁকের পইখ কারো রোদন বোঝো না
তোমাদের এক সোনালি অতীত, বুকেই ভেঙে গেছে
গহীন হৃদয়ের পথ ক্রস করে ঝাঁকের পইখ উড়ছো
নিরন্তর স্মৃতিহীন পালকে, রক্তাক্ত খ্যাতির অন্দরে

১৯

বেদনার চেয়ে মহৎ ইতিহাস নাই।
যাত্রাপাগল মানুষের অবিনাশী উত্তেজনা
থামিয়ে দিতে পারে এমন ঈশ্বর কই!
খননে উৎকর্ণ বিচিত্রযাত্রার পাখি
সর্বরূপের একক তুমি আশ্চর্য নি:সঙ্গকলা!
ঈশ্বরের প্রগাঢ় চুম্বনে আত্মভূমে অঙ্কুরিত
পরস্পর স্মৃতি বদলে ফুলে ওঠা ব্যক্তিগত আরশ
হাত থেকে হাতে ছড়িয়ে পড়ছো ঈশ্বরের টিউমার।
তোমার নত হওয়ার শেষ জমানা; তারপর
অমৃত বেদনায় যাত্রা!
ভূমিতে উত্থিত ভূমিতেই ধরাশায়ী এক প্রকল্প তুমি
অন্ধবীজে প্রশান্তির ঘুম

২৭

বধির হয়ে ভালোই হলো
এই তারস্বর দিনরাত্রি এড়িয়ে তোমাদের গ্রাম নির্জন করে দিতে পারি।
মৌনবাসে
শহর বন্দর ঘুরে পেয়ে গেছি যখমসূত্র; ফলে মাকে এড়িয়ে যেতে সহজ হয়
আমার। তিনিও আমাকে দেখেন নদ-নদী এড়িয়ে, যেভাবে দেখতেন তার মা-
মুঠোভর্তি শস্য নিয়ে বসেছিলেন তার বাবা– কীর্তিমান। এই প্রক্রিয়া গভীর
এক
প্রহার আমাদের জন্য; যেভাবে আমরা অতীতচ্যুত হই।

ফিরে এসে দেখেছি তোমার কাছেও, পড়ে আছো পুরনো রীতি; যেন ঝলসে গেছে
সংকট ও সম্ভাবনা। আমরা যেন বিপরীত মুখ করে সেই সংসার গোছানোর কথা
বলছি– যা হারিয়ে এসেছি পথে। এই বিস্তর আর্তি থেকে কে মুক্তি দেবে! পাবো
কি অপার দরিয়া– যা দেখতে দেখতে সময় যাবে পাখির মতো?
পৃথিবী দিয়েছে নিষ্কৃতি, দুই বিপরীত পথ কান ধরে টানছে আর খসে পড়ছে
মুখমণ্ডল! এ যেন আমাদের কাল নয়, সনাতন এক ধ্যান– কোনো এক মহাপ্রস্তাব
তৈরি করে চলছে; বধির বসে আছি, জোরে বা আস্তে বাজছে বিটোফেন!

২৯

উন্মীলন বেভুলা পথ চোখের মানচিত্র পাশে
কবি ধীরে আরো ধীরে কাটো তোমার চোখ
পৃথিবীর প্রতি চক্রে হারিয়ে পোষাহাত
কী করে গণনা করো ব্যক্তিগত দিন রাত!

অপ্রেম সংকলনে ধরা যত শব্দ- নৈ:শব্দ
তাই নিয়ে তরী– পৌঁছে যায় যদি
পটভূমি উজাড় করে আসা জনগোষ্ঠীর ঘাটে
কবি চেপে আরো চেপে ধরো ভাসমান জলদ

একাও না দলেও না, ঘুমের প্রহরে বসে
ভালোবাসাহীন চাদরে জড়ায়ে গলা, শুয়ে
থাকো এপাড়েও না ওপাড়েও না, জলে
যেনো ভেসে যাচ্ছো জুড়িখোলা পাতিহাঁস!

৩১

রাজত্ব ছিলো আমার, আমি ছিলাম সেই কালের এক রাজা, জলের বিস্ময়।
ঘনবনের ভেতর হারিয়েছিলাম তারে। তারপর বেঘোর ছোটাছুটি, অজস্র যতি;
এভাবে কেটে গেলো কিছু কাল, আরোকিছুকাল পড়েছিলাম গহীন বনে।

আহার শেষে দানাগুলি ছড়িয়ে দিতেন মাতৃমানুষ; উদ্ভিদে উদ্ভিদে জারিত
জ্ঞানভাষ্য। অতপর তুমি এলে, তোমার সঙ্গে এলো পৃথিবীর নতুনতম হাওয়া।
শরীরে বয়ে গেলো তার প্রহার, ঘটলো আলোকায়ন! এভাবে বালক হয়ে গেলাম।
এক মহাসময়ের হাত ধরে আমি বাবা, আমার বাবা তার বাবা হয়ে বীজ সংগ্রহে
নেমে পড়লাম মহাসময়ের গলিতে। আমার কাছে এলো ইতিহাস, তাকে
বললাম– আমার রূপান্তরের কথা। আমার কাছে এলো প্রেম, তাকে দেখালাম
রক্তাক্ত স্মৃতি। তখন সে রাজ্যের ভেতর আমি এক রক্তাক্ত স্মৃতির মানুষ! আর
রাজত্বে ভরা জঙলি পোকার উত্থান...

৩৯

কত রাতভর তোমাকে ডেকে চলেছি আমি
শিরার আর্তনাদ থেকে ঝরিয়েছি কত ব্যাকুলতা
পৌষের দুপুরে একটি বক কেবল দাঁড়িয়ে রয়েছে
উন্মুক্ত চোখের আলো ছুটে গেছে নদ-নদী এড়িয়ে
কোথাও উদ্ভিদ জেগে আছে সূর্যের উত্তেজনায়
মানুষের চোখের ঘোর দিয়ে তৈরি স্রষ্টার
নাগাল আমি পাইনি; রক্তাক্ত বিস্ময় ছড়িয়ে আছে
চারপাশে, তোমার মুখের চারপাশে কত দিবস
ঝরে পড়ছে অন্তহীন শূন্যতায়, তুমি কি ভাবো?
রাতভর তোমাকে ডেকেছি ব্যক্তিগত দেহ থেকে
তুমি নেমে আসোনি, অথচ ঝরে যাচ্ছে দিবস
রাষ্ট্রে যাদের নিরন্তর আসা-যাওয়ার পায়ের ছোপ
আমি এড়িয়ে যেতে পারি না, এগুলোর অর্থ আছে;
আছে দীর্ঘতম বোধ, আমাকে ভাবতেই হয়
ঐ যে রেখা দেখছো, যা প্রায় শুকনো হয়ে গেছে
তার পাশে আমি বসে থাকি আর তোমাকে ডাকি
কিছু হয়তো বলবার আছে একক মানুষের!

পইখ উড়ে যাও, প্রথম প্রকাশ: ২০০৭, প্রচ্ছদ: মাবুব কামরান

সাধনা

নক্ষত্রে পৌঁছে দিও ঘুমমাখা প্রার্থনা
এখানে আমি ছিলাম না
কোনো কালেই না
খোলাচোখে দিঘি দেখার দায়ে
চোখের রগ কাটা গেছে
এ কথা বলার কি আছে!
তুমিও বলো না কিছু দুঃখ নেই
পরতে পরতে ঘুণের ঐতিহ্য

বেলা পড়ে গেলেও
ঘরে ফিরে না কেউ কেউ
ফিরলে দেখতে পেতো ইচ্ছামৃত্যুর
পালকে পালকে ছেয়ে গেছে ঘর।

হন্তারক

রক্ত ঝরে পড়ছে না ডানচক্ষু থেকে
রক্ত ঝরে পড়ছে না বামচক্ষু থেকে
রক্ত ঝরে পড়লে
একটা দর্শন হতে পারতো রক্তাক্ত

এখানে অর্ধেক মিথ্যা আছে
এখানে অর্ধেক মিথ্যা ক্ষিপ্ত
আমরা সবসময় মিথ্যা বলতে পারি না
সবসময় মিথ্যা বলতে পারলে
একটা মিথ্যা বাস্তব পাওয়া যেতো

মানুষের ছায়া মানুষকে সঙ্গ দেয়
মানুষের ছায়া ব্যক্তিগত স্বপ্নবাহক
মানুষ স্বপ্নের ছায়াও ধরতে পারে না

আলোর প্রলাপে ছায়া হয় দূর
তুমি ভাবো ইতিবাচক
আলো কেবল ছায়ার হন্তারক

একদিনের বাবা

হয়তো তুমি পূব-পশ্চিমের আসমানে মেঘ হয়ে গেছো
আর চুম্বন করে গেছো আমার অনবরত ব্যর্থমুখ
তোমার ঠোঁটজোড়া অপার্থিব কুয়াশায় ভেজা ছিলো
আমি ছিলাম দৈবপ্রেরণাহীন নরোম অন্ধকার
আমার গাত্র ডুবেছিলো অনর্থক তরলে
অঙ্গবর্গে খোদিত ছিলো দুরারাধ্য কালো কালো প্রদীপ
তোমার নবজাতকীয় শুভ্র স্বরলিপি ছুঁয়ে বৃষ্টি হলো
আমার উঠানজুড়ে; ধুয়ে নিলো স্পর্শাতীত স্বপ্নযাত্রা
আমার অতর্কিত চিৎকারে ঈশ্বর তার আসমান সংরক্ষিত রাখলেন
জমিনে পড়লো মরা ঈশ্বরের শেষ প্রজ্ঞাপন

নদী

নদী, তার সতত পুলক থেকে ক্রমেই ফুরিয়েছে নুড়ি
শিরার ভিতর চেপে রাখা বালুর মহাল
জলজ ক্রন্দন তুলে
মানুষ, তার জলযাত্রায় গলায় আটকে থাকা মহৎপাথর!
রূপালী যুবতীকে ঘুমের মুক্তা দিয়ে
ডুবুচরের বেদনা নিয়ে পাশফেরে জলসমাজ
তার চোয়ালের কাছে গোপন সঙ্গীত আসে;
শিরার ভিতর কলহের সূচনা দিয়ে
ডুব দেয় সেই নদীতেই!
পৃথিবীর সকল পিতৃজল একপাশে রেখে
গভীর মৌনতা দ্বারা মানুষ তার ক্রন্দনের রেণু
লুকাতে পারবে না ঈশ্বরের মহাফেজখানায়
সৃষ্টিসেরা- এই রক্ষণশীল বাক্য দিয়ে আর কোনো

চমকের জন্যে অবশিষ্ট ভুবন নেই
কিন্তু নদীতীরে ভোগ দিয়ে কিছু লোক হয়তো
ইতিহাস করতে চাইবে
তবুও শোধরানো যাবে না চক্ষুজল কিংবা খুনের পাহাড়

লুচেন সাংমা

দুটি পাথরের চোখ অথবা চোখের পাথর
পাহাড়ি আলো মেখে ছুটছে
আরো একবার কন্যাসন্তান চেয়ে প্রার্থনা
ঈশ্বরও বিমুখ করলেন না
দাহাপাড়া থেকে বিরিশিরি রোজ দৌড়পথ
নিয়তির গ্রাম থেকে মফঃস্বলের গুঞ্জন
হৃদয়ে তাপ ছড়িয়ে যায় টাকা
তবুও মানুষটা হারায় না, হারেও না
আরো শক্ত করে ধরে মূলের মুঠি
দাদা, আপনারা পাহাড়ে কী দেখবেন?
একটাই দেখার আছে- পঁচিশে ডিসেম্বর
আমরা সারাপাড়ার লোক এক কলাপাতায় খাই
আসবেন, দেখতে পাবেন, ভালো লাগবে।
ফিরতে ফিরতে ভাবি-
লুচেন সাংমার অহংকার দিয়ে
সংবিধানের চার মূলনীতি সংস্কার করা যায়!

তত্ত্ব

ঘুড়ি উড়িয়েছে যে ছেলেটি
মহাশূন্যের দিকে যার চোখ বাড়ানো
তার সঙ্গে ঈশ্বরের ভাবগল্পে
ধরা পড়েছিলো যাদুময়তার ঘোর!
ছেলেটি তার নাটাই হারিয়ে এসেছে বহুদূর

হারিয়ে এসেছে ঈশ্বরও

এক অবিনাশী সংশয়ের কালে
হৃদয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তৈরি হলো
পরস্পর স্থিরকৃত রোদনভাষ্য।

তবুও দুটি আশ্চর্য চোখ তার খোলা রয়েছে
ঘুম, কাম, জ্ঞানতত্ত্ব টপকে গিয়ে
মরামাছের ভিতর ঘোর হয়েও দেখেছে
ঈশ্বররূপী নিঃসঙ্গতা ছাড়া
নতুন কোনো যাদুময়তা লিপ্ত নাই
ছেলেটি তার নিঃসঙ্গতা হারাতে চায় না বলেই
পাথরে পাথরে ঈশ্বর খোঁজে

প্রেমের কবিতা

পাতা ঝরে পড়লেই ছোটকাকুর কথা মনে হবে; মাথায় ভন ভন করে পাতামুখর হাওয়ার স্কুল। ছোটকাকু পাতার বাঁশি বাজাতেন অবাঙ বিকেলে ঘুরে ঘুরে; অল্পের জন্য রিনাখালাকে মিস করেন এই বসন্তময় দ্যুতির পুরুষ। এরই মধ্যে অনেক ঋতুর আসা-যাওয়া আর কয়েক বছরের ঠ্যাক। ছোটকাকু এখন গাছতলার জটওয়ালাসাধু- কাঁচা ঢেঁড়শ চিবান দুইগাল ফুলিয়ে। পেছনে তার আরো এক ভূগোল; মানুষের ব্যক্তিগত স্তনন। ঘরের বাইরে তার ঘর; পুষ্করিণীপাড় জইয়া গাছের তল।
যেকোনো উত্তরণের মন্ত্রদায়ক, ত্রাতার সায়র জটওয়ালাসাধু- তখন গ্রামের অনেক সন্তানকাম্য নারীর পারহওয়া সেতু!
মাথায় ত্রিকালবিস্তারী ঘোমটা টেনে রিনা খালাও এসেছিলেন একদিন বাঁজার উপশম নিতে

এভাবে কি আর হয় রিনা খালা!

নির্জর্ন দুপুর

খোলামাথায় হাওয়া ভরে সেদিন নির্জন দুপুরে
তোমাকে দেখেছি চড়ুইপাখির উড়নদৃশ্যই দেখছো

দুপুরে তোমার একলা দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের
শহরে নতুন কোনো ব্যঞ্জনা নয়
তবুও তুমি আছো প্রকৃত দৃশ্যবেদনার মতো
আলোকিত আর রহস্যময়
কিছুই করার না থাকলে আমাদের ঘুম পায়
আর ঘুমের ভিতর পায় স্বপ্ন
দুপুরজুড়ে
এও এক প্রকার অসুখ, কিন্তু ঐশ্বরিক!
ভেসে নির্জন তন্দ্রার স্রোতে
অজগরের মতো পৃথিবীর পিঠ থেকে গড়িয়ে
সকল ফলবান বৃক্ষ পাশ কাটিয়ে
আমাদের যে ছোটবোন, যার আয়ু ছিলো তিনমাস
সাতদিন, তার খণ্ডায়ু পার হয়ে অস্ফূট ঘোরের ভিতর
এই নির্জন দুপুর
নির্লিপ্ত নয়নের পাশে টলটলে জলের অক্ষর!

মুক্তিযুদ্ধের কবিতা

জগন্নাথকান্দি গ্রামের উপর তখন আসমান নাই! দক্ষিণের চকে উন্মুক্ত আলোড়নে যা ঘটেছে, সাক্ষী থাকেনি কোনো চান-তারা-গ্রহকুল! পশ্চিমে গোপীরমার লাউমাচায় শাদা শাদা ফুল, উত্তরে জগন্নাথকান্দি মাথাভাঙ্গা গ্রাম। পূবের গোরস্থান ধরে রাত্তিরে ছায়েদ আলী হাঁটে, নিজের ছায়া বিমুক্ত করে জিকির তোলে আর সোলেমান শাহ'র সঙ্গে লাইন লাগায়!

দক্ষিণে দ্যুতিময় হাওয়ার সড়ক- মড়মড় করে মাটি ফাটে মিষ্টি আলুর ক্ষেতে, অবিশ্বাস আঁকড়ে ধরেছিলো তোরাব আলীর বোবা মা- গতরের ওপর পাষণ্ড ভর– মাটি-মাংস-শরীর-শৌর্য, অনাহুত শীৎকার- 'মানুষের সঙ্গে মানুষের ডর নাই!' নারীদেহ ভেসে গিয়ে আজব আন্ধারে, আত্মা অবধি গড়িয়ে যায় এক নতুন সত্তা!

সেই অবাঙ রাতের আয়ুষ্কাল বর্ণনা করা বাঁদুড়গুলো আর ফিরে আসেনি! তারপর এককুড়ি তেরো বছর ধরে রাত্তিরে দক্ষিণচকে, বাবা আবিষ্কারে যায় তোরাব আলী

তারাবাতির অতিথি আলোর রূপসী স্টেশনে

একদিন নন্দনকামনাসহ খাদে পড়ে যাওয়ার সময় সঙ্গীসাথীরা দেখতে পেয়েছিলো। অনেকেরই হাতে ছিলো অবমুক্ত করার মতো পাখি। তার দুয়েকটি ছুড়েওছিলো ঘোরের নিশানায়। কার সোনালী আদেশে পশ্চিমমুখী পাখিগুলি মিলিয়ে গেলো, বোঝা গেলো না। খাদের চারপাশে মেঘধারী হাওয়ার ঘুরঘুর; মানবের ধূসর অনিশ্চিতি গড়িয়ে গেলো ঈশ্বরের বিদিত অঞ্চল দিয়ে। পাখিওয়ালার ঠাণ্ডাচোখ গলে পথ ভেসে গেলেও পৃথিবীর কোনো অংশে কেউ জাগেনি।
সঙ্গীসাথীরা আকীর্ণ হলো তারাবাতির অতিথি আলোর রূপসী স্টেশনে। অমীমাংসিত লিপ্সার ভেতর নিয়ন্ত্রণের বালু দিয়ে ঈশ্বর যেমন ঘোর সংশয় চেয়েছিলেন– আমরা যার যার লাল মোরগ জবাই দিয়ে তার স্খলন চাইতে পারিনি। লোহার অঙ্কুরোদ্গম সহজ হয়েছিলো, তার চেয়ে কঠিন আমরা চেয়েছিলাম বলে। পরস্পর নিরোধের খেলায় মজা পায় তার ভেতর গুঞ্জরিত তপোবন।

খাদে পড়ে গেলে অতসি আচ্ছাদনে মুড়িয়ে দেয়ার মানুষ আমি হয়তো পাবো!

হারানো বিজ্ঞপ্তি

যদি পেয়ে যাই খুনির মাতৃভাষা
পাথরে পাথরে বিরতি দিয়ে
ছুরি খুলে দাঁড়িয়ে আছো যে, তোমাকেও বলি-
নাব্যতা হারানো এক নদীর রগ চুষে
জাগ্রত আছে বিরতিহীন ভূমিশাবক

যদি পেয়ে যাই রোজা লুক্সেমবার্গের কবরের খোঁজ
ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটিও
গণিত শিখে আমপাতা জামপাতা গোণে
তাদের সংসার চলে যায় গাছ-কুড়ালের দোভাষী রূপে

যদি পেয়ে যাই স্মৃতির রক্তচোষা পয়গম্বর
অবিরাম নিয়তিবাদী অন্ধ কীর্তনগায়ক

যার কাঁধ ডুবে থাকে সুরের গোধুলিতে
চরণে প্রার্থনা দেবো, দেবো সবটুকু অধিরতা

যদি পেয়ে যাই অন্ধকারে সর্পচক্ষুর নীল আলো
ফিদেল ক্যাস্ত্রোর প্রধান জোব্বা কিংবা
তার ভিতরে মোড়ানো সমতাধর্মী ওম
আবার সাধারণ জলে ভিজবে দুটি প্রতারিত চোখ!

নির্জন স্কুল

নির্জন মুখ পার হয়ে যায় চঞ্চল ক্ষুর
ক্ষৌরকর্মার চিন্তাবীজ আহার করি
গন্ধ খাই তনুর
অনির্দিষ্ট স্মৃতি, অনির্দিষ্ট ঘুম
কার ঋতুর স্রাবে ভেসে যায় নির্বিকার
পুরুষের দুর্লভ প্রতিভা

মেঘের শিশ্ন দেখে সরস্বতীর কাম জেগে ওঠে
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। নির্জন কই!
আমাদের স্কুলে বিদ্যার বদলে বৃষ্টি বিতরিত হতো
আবার তোমাকে পাবো নির্জন স্কুল!
হরিদ্রা গ্রামের ভিতর খড়িমাটিশাদা
গোধুলি আসক্ত বালকের আঙুলসূত্রে
উতলা বসতবাড়ি, চোর, নারী, বাগডাশ
মূলত সবাই নির্জনে খোলে!

লক্ষ্য উদ্দেশ্য

তখন মান্দারে মান্দারে লাল খেলনাপাতি
চুকচুক করে খাই মিথ্যা-অন্ন
গুলতি ও চাড়ার দান এড়িয়ে
আসে গাওয়ালের হাঁক-

'চুড়ি আলতা নেবে, লাল টুকটুকে আলতা'

নাছিমা খালা, রাশিদা আপা ভরসাভরা নদী
জীবন থেকে জীবনে গ্যাছে যাদের কীর্তি
তাদের মুখে তাকিয়ে দেখেছি গাওয়ালের ছায়া।
কোনোদিনই বড়ো হতে চাইনি
চেয়েছিলাম ফাটা ফালগুনের মাঠ
এক ধরনের রমণীয় তন্দ্রাছাওয়া খেলনাপাতি

পোশাকশ্রমিক চরণে

সেলাইল থেকে দুটি চোখ মাঠের দিকে যাত্রা করে
ধূলার থেকে উঠে সতত ইচ্ছার ডিম
এই নরোম রোদে তোমার অভিলাষ পুড়ছে না
বোনটির কথা ভেবে ভেবে
ভাইটির কথা ভেবে ভেবে
একদিন আগুনের নিয়মে হৃদযে রেখেছিলে পোড়ন
হে বোন, বিতাড়িত ছায়া হয়ে গেছো
পুকুরের নিমজ্জন হয়ে গেছো
কেনো ফুটে উঠছে না নিজ নিজ দেহের আযান
খাদ্যশূন্যতা, ঘুমশূন্যতা এই সোনার দেশে
তপ্ত ভাতের ভিতর, নিষ্পলক চোখের ভিতর
সারারাত একি ইশতেহার তুমি পড়ছো
স্থিরভাষ্য গণিকার পাহাড়ে বসে
কোনো আধুনিক গতিযান ছুঁতে পারে না
দেহের মর্মরিত অধিগমন কিংবা সদিচ্ছার শ্লোক
প্রাচীন দন্তীয় সভ্যতা দেহকোষে ছড়িয়েছে
নিদ্রানাশা আলোর কোলাহল
চোখে পলক পড়ার আগে লেজে কামড় দিয়ে
জাগাও রুধিরে ঘুমন্ত অজগর

হেমন্তের স্টেশনে

রূপালী বেদনা ছড়িয়ে উড়ে যাচ্ছো তুলা তুলা মেঘ
বিজনে পড়ে আছে তুমুল ঘোর, খসাপালকের ব্যাগ
স্বপ্নচ্যুত তন্দ্রা খুঁজে ফিরে অধরে অধর বাড়িয়ে
যে গেছে চলে কলমির মতো নুয়ে লকলকিয়ে

কোন্ ইঙ্গিত তুমি বহন করে চলছো স্বতন্ত্র পালকে
এখানে মুখ ঢেকে গেছে যবুথবু সতীর্থের আলোকে
নিরন্তর মাথা তোলে ধানবীজ ছড়িয়ে সুহৃদ রীতি
তবুও কি ছলিমের ঘরে পৌঁছোয় ফসলের প্রীতি!

দেহাতি যে নদী ছিলো কোনো এক কথকের কালে
যাযাবর জলসমাজ চোখ মুছে ফিরে গেছে
জ্ঞানকাণ্ডের আড়ালে
সময় তার সাধারণ বিমোহ ছড়িয়ে
স্বপ্নবাজ মমিনের হাতে দিয়ে চলে ঋণ
হেমন্তের স্টেশনে দাঁড়িয়ে বেঘোর কালো যুবতী শিরিন!

উরোগামী পথ

নিজের মতো পথ ধরে গেলে কোনো জনসভায়, আলো রণ সন্ধ্যায় মধুমণ্ডিত প্রেরণা আর প্রখর খতিয়ান ভেদ করে, কারা এসে দাঁড়াবে সম্মুখে, জানো কি না! নিঃসঙ্গ পা, রক্তবর্ণ অধর তোমাকে যদি উৎস ছাড়া করে শোণিতে ছড়িয়ে দেয় হাজার প্রকার উঁই! হে পরিব্রাজক তাই। তাই তোমাকে বলছি নিথর সমতটে দাঁড়িয়ে

যখন আমার স্বপ্নবোধ; একদল পুত্রখাদক কনফারেন্স করছে! এই অবারিত আলোয় অযথার্থ উপায় আর উদ্ধার দূরাসন্ন- আমার এই উরোগামী পথ দিয়ে যাবো তৃণকে ডেকে। সকল গর্ভপাতের ইন্ট্রো দিতে হবে আমাকেই শিশ্নের ত্বক কেটে কেটে!

একজন জুনাবালি

ঘোর কেটে গেলে আমি হবো জুনাবালির নির্লিপ্ত চোখ
আসতে যেতে তোমাদের ছায়াতাড়ানিয়া রৌদ্রে উড়িয়ে
দেবো ইচ্ছামৃত্যুর ধুল।
মানুষ থেকে আরেক মানুষে উদ্যত নিঃসঙ্গতা,
কুশলকাব্য, পাখিশিকার সব অর্থপূর্ণ আয়োজন
পার হয়ে গিয়েছিলেন জুনাবালি।
আমি সেই দূরতম মানুষটির কথা বলছি-
যার হৃদয় আলোর খাদ্য আর অবিস্মরণীয় সংশয়!
ঘোর কেটে গেলে আমি হয়তো মধ্যপন্থি ছায়াদর্শী হবো
কিন্তু প্রখর নির্লিপ্ততা আর জুনাবালির দীর্ঘাবয়ব
আমাকে কোনোদিন ছেড়ে যাবে না
তবুও আমি হয়তো জুনাবালির তামাটে হৃদয় হবো না
মাঠের প্রান্তছুঁয়ে যাওয়া রৌদ্রে যে রঙবিবর দেখেছি-
সেখানে স্বপ্নচ্যুত কৃষিকাব্য হাতে উড়ছে জুনাবালি
আমি তার প্রখর উদ্দেশ্য স্বপ্নমণ্ডলে ধরে রাখি

লাইবুড়ানী

হাঁটতে হাঁটতে সোনাবান্ধব বন
বড়বেলার রক্ত হয় ছেলেবেলার বর্ষা
মেঘের ছুরিতে কাটে বুকের স্ফুলিং
যন্ত্রজালিক চোখের ঘোরে অশরীরী
ঘুমের ডিম; হাওয়ার পুলক পেয়ে
পাতায় পাতায় ঘুরে বৃষ্টিবিরহে
তার নাম পরিযায়ী ভাসান
ভাসানও আছে, তুমিও আছো
চঞ্চল মাছের কানকোয় ভরা আগুন

সোনাবান্ধব বন ঝরে বর্ষার রেণু হয়ে

মেঘ ডাকে আর ভাঙে কৈমাছের ঝাঁক
আমরা ভাঙি ঝাঁকের ভিতরে একা
লাইবুড়ানী খেলায় জলমগ্ন বালক
ফেলে এসেছি প্রতি বর্ষায় একটি পালক

বসন্ত দাসের মরামেয়ে গ্রামে আসে পূর্ণিমা হয়ে

পিপাসিত মুখখানা চোখে পড়ে
জানা গেলো এই ঘরেই থাকেন বসন্ত দাস
যার মরামেয়ে চিতার আগুন থেকে উড়ে গিয়ে
গ্রামে ফিরে ফিরে আসে পূর্ণিমা হয়ে
আগ্নেয় মানবীর এই আগমন
পূজনীয় মাত্রায় উন্নীত জনপদে
সেই থেকে বসন্ত দাস কন্যাবিয়োগ
সামলে নিয়ে এক গর্বিত প্রণোদনা।

বালিকা ফিরে আসে পূর্ণিমার রাতে
বালিকা ফিরে যায় পূর্ণিমার রাতে
স্বাগতিক এই গ্রাম পূর্ণচাঁদের ছোঁয়ায় আলোকিত
হারাতে চায় না তার কোনোই গৌরব
মানুষ থেকে মানুষে কাঠি বহন করে চলে
আর অতিকল্পনার ঘোর মাথায় একা মানুষের মুখে
জটিল খনন শেষে এই লোকালয় ঘুমের নিমজ্জন
চারপাশে প্রহরারত ঐতিহাসিক অনির্বচন
ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে ভাব ও বৈদগ্ধতায়
যার মূলে গ্রামখানা শতবর্ষী নিঃসঙ্গতা নিয়ে
উজানমুখি এক ভাবের নৌকা
যেমন বসন্ত দাস কন্যাস্মৃতিতে এক অবিরল মানুষ
ঘুমে ও জেগে থাকায় সমান দৃষ্টিক্ষম
পূর্ণ মৌনতায় ভাবচক্রে নির্লিপ্ত এক বঙ্গমাঠ

স্বপ্নে বাড়িফেরা

বাড়ি যাবো, বাড়ি
সোনার বসন খুলতে খুলতে
শ্রাবণ মাসের শেষে
দুয়েকটি মেঘ অনাড়ম্বর, দুয়েকটি মেঘ রাধা

মায়ের জন্য পানের বিড়া
দিনদুনিয়ার তত্ত্ব তথ্য কালপুরুষের ব্যাখ্যা
অগ্রজ কোন্ আলো এসে ঘাড়ের উপর নাচে
সাদাবাড়ি, পূর্বপুরুষ, হীরকপতন দেখি
মাঠের মানুষ দুপুরজুড়ে শঙ্কা কিংবা সামন্ত গান গায়

বৃষ্টিবাতাস ছায়াসন্ধ্যা মুখের অশেষ রেখা
কে নিয়েছে শোকের আঁটি কে নিয়েছে মুকুর
বোনরে তোর হাতের তালু এতিমখানার পুকুর
ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠলাম বিস্মৃত সে রাতে
স্বপ্নে এমন বাড়িফেরা কান্না কান্না লাগে

সম্পর্কশাস্ত্র ০৫

তোমাদের হেঁটেযাওয়া পথে
বেদনার দানা ছিটিয়ে পাখি ধরি
কেউই আমাকে পাখিওয়ালা বলে না
আমিও পাখিদের গণিত বুঝি না
যেটুকু ইঙ্গিত পাই
হাওয়ায় ছড়িয়ে দেই
আবার নতুন করে বেদনার পাশে বসি
তোমাদের মুখগুলো একেকটি স্মৃতির দুপুর
তোমরা আমার ঘর গুছিয়ে বাহির করেছো সুদূর
আমি ঝরাপাতা হলে ঋতুর অপেক্ষায় থাকতাম
মেঘখণ্ড হলে পাহাড় এড়াতে চাইতাম

আর পাখিওয়ালা হলে
ভাই বোন প্রেমিকা বন্ধুকে প্রার্থনায় বলতাম
তোমাদের মঙ্গল গাইয়ে হবো না আমি
হবো পেছনপথের ধুলকুড়িয়ে
যে ধুল চোখে মেখে অন্ধ হওয়া যায় অকাতরে

মরিয়মনামা

০১.

সবকিছু ভেঙে গেলে গড়ে ওঠে কীটদষ্ট একক
একই সঙ্গে বাড়ে মৌমাছির রক্ত আর মধুসঞ্চয়
তারপর ভরা আর শূন্যতার খেলা
গহিন আঁধারের বুদ্বুদ থেকে আলোর রণে
ফুটেছে যত দূর অতিক্রমের বিজ্ঞান
তার নিকটেই মরিয়ম শুনেছে ভাঙনের গুনগুন

হারিয়ে গেছে মরিয়ম পালকে ঘটিয়ে রক্তিম উন্নয়ন
তার ডানার বাতাস অন্তরীক্ষে বাজায় স্মৃতির হাড়কণা
সমর্পণের ভোরে সে প্রাণ রেখেছিলো প্রাণে
জীবনশাস্ত্র করেছিলো পাঠ শ্রেণীর প্রকরণে
সে মধুর বাসনা জনপদে ছড়িয়ে গেছে বুনো ঘোর
মৌন মানুষের অন্তঃস্থ আহরণ পুড়তে পুড়তে
ফেরারি করে গেছে সভ্যতা।
মরিয়ম তার সোনালী ঘোরে বেঁধে স্মৃতির কঙ্কাল
বৈসাদৃশ্যের নগরে করেছে পাষণ্ড সত্যের চাষ।

০২.

উড়ে এসে ডালে বসে পাখি
সিক্ত নয়নে আকাশ দ্যাখায় রোদনের কালাপানি
যে মায়াবী হেঁটেছে এই গোপ্টাপথে
তার আশীষ আছে শূন্যতা জাপ্টে ধরে!
ও মেঘ বিরহী, জানাও তোমার স্মৃতির ভূমি

সে কোন্ ঘরের দুয়ার করেছে বন্ধ আমি কি জানি?
বহুপথ ঘুরে এসে এখানে শান্তি আছে, যদি সে জানে
কী করে তৈরি হয় শূন্যতা!
বিদায়ের কালে ফাটাপ্রদীপের আলো নাচে ঘরে
চকের বাতাস এসে দুয়ারে লাগে
ডালে বসা কোন্ পাখি পালকে ভর দিয়ে শূন্যতা ধরে!
মরিয়ম খালি ঘুরে কষ্টের জাদুঘরে

০৩

হাঁসগুলো জানে পাড়ি না দিলে পালকে কত রক্ত জমে
যৌথ ইতিহাস বুননের দায় জাপ্টে ধরে ব্যক্তিগত ঘাড়
তবুও মাঠে চাষবাসের মতোই তোমার অহংকার ছড়ায় আশা
মনজুড়ে বিরহ-গৌরব গড়ে তোলে সোনালী কুহক
করমর্দন শেষে মুঠো ছেড়ে দিলে, মাটিতে পড়ে সম্পর্কের খোল
কেউ তার অল্প জানে, কেউ না জেনেও মেনে নিয়েছে এই রীতি
তোমাকে আর রক্তে মেশানো যায় না মরিয়ম
সন্তান অবধি ছড়িয়ে গেছো অভিলাষের ঘুণ
কারো কারো ঘরে ফেরা হয় না বলেই তৈরি হয় বাকি ইতিহাস
একদিন তোমাকেও মাতিয়ে যাবে নিঃসঙ্গ তুফান

০৪.

মনুয়াপাখি ঘিরে যে আগুনের বিস্তার
পাড়াজুড়ে ছড়িয়ে গেছে তার আগ্নেয় গান
হৃদয় থেকে দূরে আমাদের বুদ্ধির বিজ্ঞান
তারে করেছে সংশয় হারা রোদনের নালা
বাড়ন্ত শস্যের উপর দিয়ে বয়ে চলা হাওয়া
নিরন্ন কৌশল মাখে মুখের আদলে
দেহ থেকে ঝড়েপড়া অধিরতা
তৈরি করে নির্জন ছায়া
একদিন হাত দেখার ছলে এড়িয়ে গেছি করমর্দন

একদিন জ্ঞানতত্ত্বের ঘোরে ভেঙ্গেছি শস্যের ডগা
মরিয়ম জানতো না ভাঙনের অধিক কলা!

০৫.

দেহ থেকে তন্দ্রা নেমে এসে মিলায় দেহে
ফুলে ফুলে ওঠে মাংশের গান
তাকেই স্মরণ করে চলে উজ্জ্বল হাহাকার
আমাদের নিয়ে বিস্তর চাষ হলো আগুনের
আগ্নেয় রীতির এক জীবননালা ঘুরছে অবিরল;
নম্রপথ শুনিয়েছে তার ধুলোসঙ্গীত।
যাদুর বাগানে ছিলে, যাদুর বাগানে গ্যাছো
সে ঘোর লক্ষ্য করে চলে স্বপ্নশুনানি
মরিয়ম যদি থাকো ঘুমে আর মরিয়ম যদি থাকো জেগে
ধরে রাখো অবাঙ উৎস ফুঁড়ে উঠা মৌন ক্ষরণ
আর চোখজুড়ে অতসী ঘুম
মানুষ শুধু স্মৃতির বাঁশি, ছিদ্রে ছিদ্রে রোদনের নতুন আরশ
একটি করে আঙুল টেপায় যুক্ত হয় ধীরগতির মরণপণ!

০৬

অধর ছুঁয়ে গ্যাছে পরীর বিষ
শীতল বিছানায় রাতের সেলাই মাখামাখি মরিয়ম
মাঠ আর ফসলের আশা শুনিয়ে
ফলেছে দুঃখের ধান।
মায়াচূর্ণ মানুষের বিজন হৃদয়
পড়ে আছে ঘন কামিনীর বনে
জীবন আর জীবনের পুষ্পতলা
উভয় মিলে এই পথে যাচ্ছিলো
ভোরের গাঢ় সূর্য একপাশে
আরেক পাশে নিজের ছায়া
তুমি সেই মাঠে রৌদ্র-ছায়ার ইতিউতি
একজন হারানো মানুষ, অন্যজন আন্ধারের পুতুল!

০৭.

রক্ত, রূহ, ত্বক থেকে ফলিত মরিয়ম
ঘুমের দেশে নিমশাদা নর্তকী হয়ে আছে
জগতে সকল মোহনীয় রূপের ভিতর
আগ্নেয় সভ্যতার বুদ্বুদ হয়ে কি পাওয়া যাবে
যদি মানুষই না শুনলো তার অরূপের গান!
সঙ্গীতের যাদুময়ী ঘোরে তার চলাচল যেনো
বাতাসে ভেসে বেড়ানো সুবাস।
মৃত্যুর মধ্যস্থতায় দুই রকম বাস্তবতা
আমূল ঘ্রাণের ভিতর উত্তেজিত করে
আমরা পুলকিত দূর তারাদের আলোয়
লটকনের ডাল থেকে ঝাঁপ দেয় মরিয়ম
আলোচঞ্চল ভ্রমে

০৮.

হৃদয়ের ঘূর্ণিপাকে অসীম শূন্যতায় জড়িয়ে ঘুম
দমে দমে মরিয়ম নাচে রক্তের মাহফিলে
প্রমত্তা অতীত শান্তি, সঙ্গম, নিদ্রাবিধি পার হয়ে
আপন আলোকের ভিতর শায়িত দুর্গম অনিশ্চয়তা
একটু একটু করে সঙ্গীত হয়ে ওঠা রক্তগতি
রুখে দাঁড়ায় সীমাহীন মৌনতা
আর ডানা বাড়িয়ে তুমি ধরছো মরাঈশ্বর
একটি হৃদয় থেকে একটি বিহ্বলতা দূরে থাকে
তুমি থাকো বহুমুখী রেখার মতো গন্তব্যবিমুখ

০৯.

অনন্ত প্রহরে প্রহরে স্বপ্নজারি করে
সামন্ত শহরে খুঁজছো ঘরছুট অবাঙযাত্রা।

কবরের সন্ন্যাস ফুঁড়ে আসে মৃতের স্তুতি
বাতাসে বাতাসে উপেক্ষিত মৃতমানুষের গুঞ্জন
মাঠের তির তির হাওয়ায় ওড়ে
সোনায় রূপায় মোড়ানো সেই ব্যর্থমিলন।
ডানায় ক্লান্তির প্রসারমাখা জাগৃতি
তার ভিতর ওড়ে মধ্যবিত্ত উন্নয়ন-
চাকা ঘুরায় সকাল-দুপুর-সন্ধ্যার ফাঁকে ফাঁকে
ঘুম, উত্তেজনা অপার উত্তর-দক্ষিণ শেষে
মরিয়ম দিশাহীন চোখের ভিতর মরাগোধুলি মাখে

১০.

পড়তি রোদের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখা
সারাদিন রক্তে মিশ্রিত আশার ঝুল
গ্রামের মহিমা ঘিরে জ্যোৎস্নায় নামে সগীর শাহ
শত বিপদে পথ দেখায় মাটির বান্দাকে!
তার আশীষ নিয়ে মাঠে হাওয়া ঘুরে।
এ সুবাসিত গ্রাম শুধু ধরে রাখে আবেগ-আর্দ্র স্মৃতিবদল
একা এক মানুষ আর ভালোবাসার ধুলিঝড়ে
পাকখাওয়া মরিয়ম অপরাহ্নদৃশ্যের ভেতর
উঁকি দিয়ে আছে যেনো হারোনো সড়ক

১১.

উত্তর দক্ষিণে ঝুঁকে মৃত মরিয়ম খুঁজতো সুপুরুষ বাহু
শীতল আত্মায় জমে থাকা বরফের থোক লোকালয়ে
আলোর রূপকথা ছড়িয়ে দ্যায় মানুষের বিবরে
ভরা জ্যোৎস্নারাতে দক্ষিণচকে দেখা দেয় আগুনের অজগর
আস্তে আস্তে গ্রামটা মুখে তুলে নেয় আগ্নেয় জিকিরে তুলে।
আরেকপাশে মরিয়ম ব্যান্ডেজ দেখায় ঘুমগ্রস্ত ব্যক্তিকে
হারায় না কিছুই, হারানোর নাই কোনো আদর্শ প্ররোচনা
প্রতিভার হননকারী বেগ শুধু ঘুরে মৌনমানুষের একক বিষে

১২.

জবাই হওয়ার রক্ত থেকে গেছে আর ধুয়ে গেছে শাদা বৃষ্টিপাত
পায়চারী, কোলাহল, খুনের সম্মেলক প্রতিভা সবকিছুই পূর্বাচার
মধুমুখী কথকের গুনগুনে যে সম্মোহন ছিলো, সে এক নির্লিপ্ত মগ্নতা
এর বেশি ইতিহাসে নেই, ইতিহাসে থাকে না ব্যক্তির গহিন মগ্নতা
তবুও জবাইদৃশ্য দেখে দেখে একদিন স্তব্ধ হলো প্রেরণার শূঁড়
নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি শুনে আরো দুরূহ হলো হারানো মানুষ
সমকাল পাবে কি তারে ধূলায় তরল, দাহ্য কিংবা অশ্রুপাতে!
হন্যে হয়ে মেঘগুলি পূর্ণদ্বিধার অযুত বলয় ঘুরতে থাকে
শূন্যবিবরে ডুব দিয়ে মরিয়ম জঠরব্যথা ভোলে

১৩.

ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে মরিয়ম একলা হয়ে যায়।
রাতের হাওয়ায় গুনগুন করে বর্ণিল ভাববাজার
কেউ অন্ধকারে কেউ নির্জন মাঠের আলে
দেহের মনোহর প্রতারণায় একলা মানুষ বিলুপ্ত ঊষা;
বন্ধকী রীতির বিপরীত দ্বিচারিতায়
দেহ থেকে দেহে প্রস্তাবিত নহর-প্রতারণা
তার পাশে মানুষ অনুরণিত তিমিরের উদ্দীপনা
ঘোরসংশয়ে হারিয়ে ফ্যালে ত্রিকালদর্শী নয়নখানা
এভাবেই শুরু ইচ্ছামৃত্যুর স্বাধীন সম্ভাবনা
তখনো মরিয়ম ঘুমের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুপ্ত পয়গাম্বর
সত্তার নিগুঢ় উন্মোচনে উড়ায় জটিল ডানার পাখি

১৪.

জগতের ভাবডালে বিমূর্ত ফলের মতো দৃশ্যত
অন্ধের থালায় পড়া চমকপ্রদ আধুলির
রূপাবিদ্যুৎ ছড়ায় তোমার মুখ
জলার রৌদ্র-ছায়া মনোহর ঘূর্ণিহাওয়ায়

উড়ছে যত জলকণা
তার পাশেই নামছো সাধারণ রক্তিমাশা!
সৌরবর্ষের একপাশে স্মৃতির দেউল আরেক পাশে
ঘুমন্ত নারীমুখ; নিয়ে গেছে নির্জন দুপুরে
তখনও মরিয়ম চোখের গহিনে পূর্ণ আস্থার ডোবা
দুই হাত তুলে লুফে নিতে থাকি ঈশ্বরের নারীভাবনা

১৫.

গোধুলি নির্ণয়ী আলো দিগন্তে মাখায় মেলাফেরত বাঁশি
একলা মানুষ ব্যক্তিগত কুহকে বসে ভাঙে তার শিথিল ডিম
দূরপথ হেঁটে এসে যার যার স্মৃতির ঘুণ
তন্ত্র মন্ত্রের ইঙ্গিতে ভিতরে ফুটায় অন্ধবীজ
এভাবেই আমাদের প্রিয়-অপ্রিয় মুহূর্তের
বিরল কৌশলে লিপ্ত ঈশ্বরের মরমী নিয়ন্ত্রণ।
অন্যের নিকটরেখা পার হওয়া
যায় না বলেই দূরত্ব এতো প্রার্থনীয়!
তবুও মরিয়ম গোধুলির নির্ণয়ী আলোয় আকীর্ণ গোলক
পরম সূত্রে গাঁথা তার দূরে যাওয়ার চঞ্চলতা।
সোনালী ধানের দেশে মানুষের একটিই মরিয়ম থাকে

১৬.

হারানো সংশয়ের মাতৃভাষা মরিয়ম।
জোনাকি ঘুরঘুর রাতে
পটভূমির বটে বসা বিরল পাখিসভা
আছে তার ব্যক্তিগত গুনগুনে।
বিলোপ ঘটে গ্যাছে রসিক চুম্বনের
দুই ফালি ঠোঁট শুধু দুইথোক তামাশা
সম্ভাষণের আক্ষেপে জ্বলেওঠা চোরাকম্পন
পাথরের পরতে ঘুমিয়ে গ্যাছে।
তখনো মরিয়ম বেঁচেছিলো গরম রুধিরে

১৭.

রাধানাথ ঘোষ, তুমি বুঝতে না ভবের খেলা
কানের পাশদিয়ে গুলি গেলে, ঠিকই বেঁচেছিলে
মাঠে মরেছে তোমার নারীভাবনা
তাইতো সকলে বলে- বোকা কিংবা বুদ্ধিমান
কোনোটাই ছিলো না রাধানাথ ঘোষ
গণিতকার্যে ইতিহাসখ্যাত যারা
তাদের পাশে তুমি অনর্থক মহড়া
তোমার চোখের চঞ্চল আলো
পৌছতে পারেনি সেসব সোনালী মহলে।
অন্ধকারে মুক্ত করা ডানা- শূন্যে পাক খেয়ে
হাতে আসে যখন
তখন মরিয়ম আসে বাতাসে বাতাসে আতর হয়ে
আর আলোময়, স্বপ্নভূক আকাংক্ষা ধরে
বাজাতে থাকো হাঁড়ের পোড়ন

পালকে পালকে ছেয়ে গেছে ঘর, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১১,
প্রকাশক: জাগৃতি, প্রচ্ছদ: লাকী ওসমান

০১.

শেষ হলো দ্বৈতভাবের মেলা
কেনা হলো মাটির এক ঘোড়া
সময়ের প্রৌঢ় টিউমার ঘিরে
যুগ্ম সংশয়ে ঘুরবো আমরা
এখানে তোমার দেহমোহের বাতাস

০৫.

তোমার চোর-পুলিশ খেলায়
দ্বিতীয় শহীদ আমি
প্রথম শহীদ তোমারই মন

১২.

ঘুরছিলো রিকশার চাকা
চঞ্চল সন্ধ্যার ঢাকা
মৌন মুখর দীপায়ন
ছুঁয়ে গেছে অব্যক্ত মানে
এক থেকে আরেকটি মনে
পাখি গান গায়

১৩.

ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করে
পুরনো দালানের ছায়ায়
নদী নক্ষত্র গোধূলীর মহড়ায়
নাকের ইতস্তত ঘামবিন্দু
হেলেপড়া রোদে শুকোতে দেয়া বেগুনী শেমিজ
তারপর মিশে যাওয়া কুয়াশার গন্ধভরা বাতাসে

১৪.

রূপের অরূপ খুঁজতে এসে
পেয়ে গেলাম
তোমার সৃষ্টি তুমি
বিস্ময়ে ভরা বঙ্গভূমি

১৬.

আগের মতোই চলছে
ভিক্ষুকের চঞ্চলতা ও জাতীয় মুদ্রানীতি
আজ শুধু বলা যাচ্ছে না
বাতাসে ভাসছে কার স্মৃতি!

২০.

বাজারের চোতার সঙ্গে
হারিয়ে ফেলেছি
মন খারাপের দাবি
ভুল পথে হাঁটিস যদি
আমাকে তুই পাবি

২৩.

কোনো মানুষ গ্রামে থাকে
কোনো মানুষ অন্যত্র
তুমি থাকো কোথাও না
এ ককথা কেউ জানে না

৩৮.

ঝুম বৃষ্টি
যেনো দুই খণ্ড পাথরের গান
পশমে পশমে জেগে উঠছে
তোমার মিনার

৪৪.

পাখিটা উড়ে যায় এই বলে-
উড়তে তার ভালো লাগে
সৈয়দ হাসান বিপরীত
মহলে মিশে যায় এই বলে-
তার এখন চাকরি নাই
মৌসুমী ফ্ল্যাট থেকে খুব একটা
বের হয় না এই বলে-
ঢাকায় রাস্তা থেকে আকাশ দেখা যায় না
আমি তোমাকে নিয়ে
ভাবতে শুরু করছিলাম এই বলে-
মানুষ মরলেও ভাব মরে না

৪৮.

আসমানে মানায় চানতারা
মাটিতে চে গুয়েভারা
মনের মানুষ মনেই থাকে
হারায় তার ছায়ারা

৪৯.

এখনো স্বপ্নের চৌরঙ্গীতে যাই
স্বাপ্নিকদের সঙ্গে ভাব জমে আর ভাঙে
তার চেয়ে বেশি ভাঙে স্বপ্নবাজদের খোসা
মানুষ ও প্রকৃতির কথা সাধ্যমতো ভাবি
চলে আপন স্বার্থ ও নিদ্রার যুক্তি
রিপুর যাতনা কিংবা ভ্রমে পড়ে
ঝরে গেছে অনেক কথার মোহর
পিঁপড়ের মতো স্মৃতি আসে স্মৃতি যায়
এ সবকিছু এড়িয়ে ঘুণাক্ষরে রচিত
হতে থাকে কোনো এক শূন্যতা
যা ঈশ্বর না জানলেও, কালো মেয়েটি জানে!

৫০.

চিঠি পাঠিয়েছে জনতা ব্যাংক ধর্মতলা শাখা
অনিয়মিত লেনদেনের ফলে বন্ধ হতে চলেছে
আমাদের যৌথ সঞ্চয় হিসাব।
কর্তৃপক্ষ জানেই না
আমরা এখন নিয়মিত করছি
নতুন দুটি আলাদা হিসাব।

যৌথ সঞ্চয় আসলে মনের ওপর
তেমন প্রভাব ফেলে না।
কথাটা প্রথম বয়সে বুঝা যায় না।

৫৩.

জলের বন্ধু মাছ
মানুষের যেমন কার্ল মার্কস
তুমি আমার কেউ না
স্বপ্নমুখরিত সার্কাস

৫৪.

মানুষ বিশ্বাস করতে চায়
মানুষ বিশ্বাস করতে না-ও পারে
মানুষ চাইলে অন্ধকারে
আগুনও লুকাতে পারে
পারে না বিশ্বাসের এক বালিশে
টানা ঘুমোতে।

৫৬.

সুঁই, সুতা, সেলাই
এ তিনে যা বলে
সকলেই তা বলবে
তুমি চলে গেলে

৬০.

একনদীর উজান ভাটি আওয়ামীলীগ আর বিএনপি
দুই মনের এক মানুষ কোথায় নেবে বিরতি?
পেতে পেতে হারিয়ে ফেললেন এনজিওআপা মলিকাদি
নিজের সঙ্গে মনের কথা বলতে তুমি পারো কি?
জানতে চেয়ে চিঠি লেখে স্কুলমিস রিজিতা
মালির কাছে ফুল চেয়ো, ডিমের কাছে ছা

আগে বলতাম এখনো বলি দূরে যাবি, যা

৬২.

তুমি চলে গেলে সঙ্গে যাবেন মওলানা ভাসানী
যিনি বঙ্গমনে ছড়িয়ে ছিলেন স্বপ্ন দেখার বাণী
কোম্পানিকাল গত হয়ে কর্পোরেটের আগুন
ঘরে ঘরে ছড়িয়েছে মনভাঙনের ফাগুন
তুমি গেলেও থেকে যাবে বসু মিত্রের গান
দেহতত্ত্ব, মরমীবাদ স্মৃতির তুফান

৬৯.

বাতাস ছুঁইলে কী হয়?
তুমি বলেছিলে আরাম
আমি বলেছিলাম কিছু না

আমরা তখন জানতাম না
এ কথাটাও বাতাসে থেকে যাবে

৭১.

আষাঢ়ে বৃষ্টি হবে
এর জন্য না লাগবে দার্শনিক, না কবি।
একজনতো লাগবে
যে জানালায় বসে আনমনে বৃষ্টিতে হাত ভেজাবে!

৭২.

কি দোস্ত,
গণতন্ত্র আছে?
- নাই
গণতন্ত্র ছিলো?
- দেখলাম না তো
গণতন্ত্র আসবে?
- বলা কঠিন
মহিমা চৌধুরীর মনের চেয়েও!

৭৩.

বৃষ্টিদিনে তোমাকে মনে রাখবো না
মনকেই পাঠিয়ে দেবো তোমার বাড়ি
তোমার ঘ্রাণের ভিতর বাতাস হয়ে
মানুষের সঙ্গে ছিন্ন করবো সব যোগাযোগ

৭৪.

কোথায় থাকো না তুমি?
- সবখানে
তবে কোথায় থাকো?
- সেইখানটাই তুমি হারিয়ে ফেলেছো

৭৫.

মানুষ না হলে তুমি কী হতে?
- বাতাস
বাতাস না হলে?
- অন্ধকার
কেনো?
অন্তত ঘুমানোর আগে যাতে তোমার দরকার হয়

৭৬.

কি মামা,
মাথার ভিতরে মিসকল মারে কে?
একটু পরপর মনে পড়ে যে!

৭৯.

বেদনা নাই
উঠে গেছে নারকেল গাছে
যার তাৎপর্য ছড়িয়ে গেছে পাগলে

৮০.

টিকেট চেকার হলে জানতে পারতাম
কোন্ মানুষ কোথায় যায়
হাত দেখতে পারলেও মন্দ হতো না
নিজের ভাগ্য জানার আগ্রহ থাকতো না
কিছু না হয়েও একপ্রকার আছি
যেমন তুমি না থেকেও
খেলছো কানামাছি

৮২.

ছিলাম একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ
যেমন তুমি বিএনপি আমি আওয়ামীলীগ
মুদ্রা হারানোর পর বুঝতে পারলাম
মুদ্রায় ঐক্যের সঙ্গেই থাকে বিপরীত

৮৪.

দৃশ্য থেকে দৃশ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি যাকে
স্বপ্নের নিঃশর্ত পলকে
খুঁজতে আসবো না তাকে স্মৃতির ফলকে
দানের অহংকার কিংবা ঋণের করুণা দিয়ে

মুছতে পারবো না
আমারই অতীত- গ্রীষ্ম বর্ষা শীত

পারলে ভুলে যেও
না পারলে তুলে দিও শিশুদের স্কুলভ্যানে

৮৫.

মাকে বলেছিলাম- পাইয়ে দেবো
গোল পৃথিবীতে সবচেয়ে দূরে যাওয়াতো
নিজের কাছে যাওয়া
গতি ও যতির হাটে
তুমি পেয়েছো যারে, সে পায়নি তোমারে
আমি পেয়েছি তারে
অন্ধ যেমন পায় অন্ধকার

৮৭.

তারার পাশে তারাই থাকে
অপূর্ব আছো তুমি আর সে
জমিনে থেকে তাকাবার
আমি আসলে কে!

৮৮.

সাদাকালোর ফাঁকে
আমার মন থাকে
তার ভিতর
তোমার খেলনাপাতি

৮৯.

কার জল কে সিঞ্চন করে ভুল শস্যের তিমিরে
কে খুঁজে ফিরে তারে দুনিয়ার শরণার্থী শিবিরে
যুক্তি তর্ক সকল অভিজ্ঞানে নিয়তির শেষে

বিপণ্ন ঘোর সংশয়ী হরিণীর গন্ধে মেশে
আপন মাংসের ভিতর রাখে লোহার ক্রন্দন
আমরা খুঁজে পাবো কি সেই লুকানো নন্দন!

৯০.

অখিলের ডুবুচরে আটকেপড়া মীন
রূপালী শরীর থেকে হারায় সুদিন
নদীর কাছাকাছি নিরন্তর জলে বাঁধা
তার অনাড়ম্বর রোদনের ধাঁধা
তুমিও না আমিও না
স্বয়ং ঈশ্বরই ভাঙতে পারেন না

৯৪.

আমাদের মফস্বল থেকে
ট্রেন ছেড়ে যায় ঢাকা
অনেক দেখেছি
কী করে ঘুরে ট্রেনের চাকা
মানুষও ঘুরতে ঘুরতে
কোথাও পৌঁছে যায়
ট্রেন লোহার উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়
মানুষ ট্রেনের পেটের ভিতর ব'সে
পুরনো অনেক কাগজ ছিঁড়ে, মুচড়ে
জানালা দিয়ে ফেলতে ফেলতে যায়

৯৫.

মিনার হলে
স্বপ্নের মৃত্যু হয়
স্বপ্নের মৃত্যু হলে
কিছুই হয় না
এ জন্যই তোমার ঠিকানায় চিঠিগুলো পৌঁছে না

৯৮.

ঘুম থেকে উঠে বুঝতে পারবে
রাতে বৃষ্টি হয়েছিলো
ঘড়ির কাঁটা দেখে বলতে পারবে
এখন ক'টা বাজে
কী করে বুঝবে
অপেক্ষার পর চোখ মুছে ফিরে গেছে কেউ!

৯৯.

আমার কোনো রাষ্ট্র নেই
গ্রাম আছে
আমার কোনো মতবাদ নেই
আত্মা আছে
সেখানে তোমার চুল পাওয়া যাবে।

১০০.

উৎসবের মানুষ আলোভরপুর
উৎসের মানুষ স্বপ্নবর্তী
মনের মানুষ ঝাঁপসা থাকে

১০২.

প্রতিদিন তোমার স্নানঘরে
দেহের সঙ্গে জল মিশে
গড়িয়ে যায় কোথায়!
তারপর জল আর দেহ
কেউই চিঠি লেখে না

১০৩.

তুমি থাকলে ডালে ডালে
তুমিই থাকো পাতায়

এ কথা লেখা থাকবে না
কোনো ঝরাপাতায়
মনেও থাকবে না
বর্ষায় হেঁটেছিলাম
একই বৃষ্টিরোধক ছাতায়

১০৪.

বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখলেও
বাঁচবে না রক্তের নাদ
যেখানে উঠেছে সংশয়ের চাঁদ
স্বতন্ত্র দেহের আগুনে
পুড়ছে বাতাসের ফাঁদ
মনেও নেই মনান্তরেও নেই
ইচ্ছাশিল্পের সুপ্রবাদ

১০৬.

মরা মাছে তার জীবনের নকশা থাকে না
থাকে না জলের ঐতিহ্যও
তবুও মাছ জলে ছিলো
এ নিয়ে আমাদের সংশয় থাকে না
আমি মরে গেলেও আমার দেহে
পাওয়া যাবে না তোমার কাঁটা কিংবা চুম্বন

১০৭.

হালের বলদ থামিয়ে
বরইতলার ছায়ায়
তামাক নিয়ে বসতেন ছোটমামা
আমি সে হাল এগিয়ে নেইনি
দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছি বিরতি

মনে হয় তোমার স্বপ্নবিরতি দেখাও
আমার সেই রীতি!

১০৯.

আপন ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধে জিততে পারে কে?
- শয়তান
আরো একজন পারে
যে স্মৃতি উজার করতে কবিরাজবাড়ি যায়

১১২.

ঘুণাক্ষরে এসে
ঘুণাক্ষরে গেছো
রিপু যেমন যায় মৃতের রক্ত ছেড়ে

১১৩.

অনেক রকম পাগল আছে
আমিও এক প্রকার
মুঠের ভিতর আগুন রেখে
খুঁজেছি তার দিদার

১১৮.

মূলত বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর আমাদের দেখা হয়েছিলো
যদিও আমরা ইঞ্জিন ছিলাম না; ছিলাম মন নামক কুহকের চর
এ কথা পুস্তক থেকে জানবে তোমার সন্তান আরও কিছুটা পর
ততদিনে আমি ছড়িয়ে পড়বো বাষ্পে, তুমি কীটদষ্ট ইঞ্জিনে
এ কথা রটে গেছে বাতাসে পিরিতির বাণিজ্যবিধুরদিনে

১২১.

সাত বছর বয়েসে কফিন তৈরি হয়েছিলো
আন্তোনিও গ্রামসির জন্য যেমনি

তেইশ বছর বয়সে সে কফিনের সামনে
দাঁড়িয়ে দৈহিক কুঁজো হওয়ার
গল্পটি বলেছিলেন তেমনি
তিনি কি বলতে পেরেছিলেন
আমার মধ্যে তোমার হেজিমনি!

১২২.

ফুলটোকা খেলায় অন্ধকার দেখে
প্রতিপক্ষের নাম বলতে পারতাম
কখনো ঠিক কখনো বেঠিক
আলোর বেদিতে বসেও
তোমাকে বলতে পারিনি
হাত ধরলেই
ধরা পড়ে না মানুষের বেসিক

১২৪.

কেনো মরতে চাই না
এ কথা বলেছি বারবার
কেনো মরতে চাই
এ কথাও বলা হয়ে গেছে কয়েকবার
কেনো জন্মেছিলাম
এ কথার মানে নিয়ে তোমার স্কুলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম
সেদিন তুমি স্কুলেই যাওনি

১২৮.

তুমি যখন জিতে নিয়েছো মঞ্চ
আমি তখন গাঙের পাড়ে উদ্ভিদ
কঠিন ধাতুতে গড়া
তোমার আক্রোশের ভিত
আমার দাঁতের নিচে কড়মড় করে

১২৯.

আমার সন্তানের ঠিকানায়
চিঠি লিখে জানতে চেয়েছো
আমি আগের মতোই রাত জাগি কিনা
তার পরের লাইন কেটে দিয়ে
তার পরের লাইনে লিখেছো
কোনো উদ্দেশ্য নেই
নিছক কৌতূহলে জানতে চাওয়া
যেভাবে আমি পিতা তুমি হাওয়া!

১৩০.

এই জেলা শহরের
প্রায় সব রাস্তা আমরা হেঁটেছি
প্রায় সব চায়ের দোকানে বসেছি
এখন অন্য কেউ হাঁটছে, বসছে
এক সময় তারাও গ্রহণলাগা চাঁদের
পেছনের টিকেট কাটবে
এই জেলা শহর ধুঁকবে পুরনো মুদ্রার ভারে
যা আমরা খরচ করেছিলাম

১৩৩.

রহিমুদ্দি কি ভাইবছো কখনো পিরিতি কী?
- হ্যাঁ, ভাইবাছি
ভাইবা কী পাইলা কওছাইন!
- না কমু না
ক্যান্ কইবা না?
ইডা কওনের জিনিস না

১৩৪.

দরাজ গলায় গান গাইতো
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বসিরুদ্দি

তুমি তার ভক্ত ছিলে
বসিরুদ্দি এখন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের শুভেচ্ছাদূত
তার মাল্টিন্যাশনাল স্পন্সর
তোমাকে বলেছিলো-
তেঁতুলের বিচি বিক্রি করেও সংসার চালানো যায়
আর মন বিক্রি করলে
চালানো যায় জীবনের বালুগাড়ি
তারপর থেকে তোমার সঙ্গে দেখাই হয় না

১৩৫.

লিপি বিশ্বাস,
আমি কিন্তু দয়ালের কাছে
নারীলোকের আতর চাইনি
তবে কেনো
সমস্ত পরিসংখ্যান ভিজা ভিজা লাগে
তার বিষ্ঠায়!

১৩৬.

সম্পর্কে ঝুঁকি পঞ্চাশ পঞ্চাশ
স্বপ্নে পুরোটাই
মানুষ হারানোয় ঝুঁকি নাই
শুধু চোখ মুছে হেঁটে যাওয়া চাই

১৩৭.

আমি কী চাইতাম?
- হাত ধরতে
তুমি কী চাইতে?
- কিছু না
আমরা দুজনে মিলে কী চাইতাম?
- শূন্য হাত

১৪৩.

আধুনিক মানুষের প্রেম হয় না, হয় চুক্তি
এসএমএসে লিখেছিলো বগুড়ার সুপ্তি

এরপর আর কথা হয়নি

১৪৭.

কারো দূরে যাওয়াতো
কারো কাছেও যাওয়া
শেষ বিচারে
মনের মানুষ ঘূর্ণিহাওয়া

১৪৯.

যখন সবকিছু দূরে সরে যায়
ধীরে ধীরে নিকটে আসে শূন্যতা
পেছনে তাকিয়ে দেখি কিছুই না
তারে ধরে রেখেছে মাঘের জ্যোৎস্না

১৫০.

বহু বছর যারা ভেবেছে স্রোতের বিপরীতে
তাদের অনেকেই চুপসে গেছে এবারের শীতে

এ দৃশ্য লুকিয়ে দেখার আমি কে!

১৫৫.

বালকবেলা দেখা যাত্রাদলের মেয়ে রত্না
দিনে তারে কেউ দেখতো না
মঞ্চ মাতানোয় তার তুলনা হয় না

কত মানুষের আকাঙ্খা এক মাথায় নিয়ে
সে দিনে ঘুমায়

তারে কি কেউ পায়?
নাকি সে আপন গহনে একলা কথা কয়!

১৫৬.

স্বপ্নের টিকেটে অনেক দূর যাওয়া যায়
যেভাবে যাওয়া যায়
সেভাবে ফেরা যায় না
তবুও কেউ ফেরে
কাঁটা কিংবা মুদ্রার ঘেরে

১৫৭.

এপারে সংশয়
ওপারে বিলাসপুর
আমরা যাবো
তারও অনেক দূর
পথে পথে মিঠা বাতাসার ঝোঁপ
শিয়াল বাগডাশের ফন্দি
ঘুম ভাঙলে দেখি
নিজের মনেই বন্দি

১৫৯.

যাই যাই করে যাওয়া হলো না
মায়াডোরে বাঁধা পবনের জীবন
গেলেও হয়তো ফেরা হয় না
জড়িয়ে যায় তোমার নীল রিবন

১৬২.

দৈনিক পত্রিকা খুলে
ক্রস ফায়ারে বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পড়ি
তারপর গ্লাস ভরে জল পান করি

অপেক্ষা করতে থাকি
আমার মৃত্যু সংবাদ কবে ছাপা হয়ে আসবে?

সে আর আসে না

১৬৩.

বার্তা পেলে নাকি
হাতের স্পর্শ পাওয়া যায়!
আমি মানুষ পেয়েও
স্পর্শ পাইনি

১৬৪.

সকলেই মধু পায় না
মৌমাছি পায়
পেয়েও তার অধিকার হারায়
সমঝদার আর দখলদারে তফাত থাকে না

আর এর নাম হয় সভ্যতা!

১৬৬.

কতবার রঙ বদল করে
তোমরা হলদেটে হয়েছো
আমি সব জানি।
আমি এও জানি
পাঠশালায় আগুন লাগলে
তুমি দম বন্ধ করে দৌড় দিয়েছিলে

তোমার মধ্যে আমি কে, জাগৃতি প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১২, প্রচ্ছদ: অমল আকাশ

আমি

মাতৃস্তনের ঘোর প্রকরণে
যেদিন দিশা হারালাম
সেদিন থেকে এ শহর আমার অচেনা

বহুজাতিক অধিকারে গেছে
জাম-জামরুলের ডাল
পাখির হাহাকারে পুড়ছে বাতাস
শস্যভাণ্ডার যাদের হাতে
তারা কেউ বলেনি– এদিকে আস

বিপুল বাসনা আমার ভেসে যায় দূরে

দাঁড়াও আমি আসছি
তখনো জীবন চুষে নিচ্ছে কোনো মূল্যতত্ত্ব
একরত্তির অন্ধকারের জন্য বসে আছে কেউ
তাকে জানাতে হবে– আমি বীরপুত্র নই
তবুও আসছি
আজকে মাঠে মাঠে বিপুল ফসল
যৌবনের ভেতর নসু ফকিরের তাবিজ
এক চুলও নড়াতে পারবে না আমাকে
পরিত্যক্ত বাড়ির উঠান থেকে
এখন সন্ধ্যা মূলত মুখে মুখে মুনাফার তালা

দাঁড়াও আমি আসছি
একটা তাড়া খাওয়া বাগডাশ এদিক-ওদিক ছুটছে
একটা নতুন টাকার সঙ্গে আরেকটা নতুন টাকা
সেলাই করে করে গড়ে উঠছে মনিবের মঠ
তাতে তোমার জন্য কোনো গৌরব রাখা হবে না
যদি পারো সব ধরনের বস্ত্র ত্যাগ করো

তারপর উঠে বসো টিনের চালে
প্রেসের লোকেরা তোমাকে সম্প্রচার করবে
তুমি তখন শয়তান উগড়ে দেবে টিনের চালে বসে

পলায়ন

বীজের ভেতর ফসলের সংজ্ঞা হয়ে শুয়ে দেখেছি
অন্ধকার দূরের জিনিস নয়
যেভাবে ভুল ফুটে ওঠে ব্যক্তির চার দেয়ালে
সেভাবেও দেখেছি নির্জন ছাড়া রিপুমুক্তি নেই
তুমি চাইলে একবার টিনের তলোয়ার নিয়ে
নামতে পারি সকলের বিরুদ্ধে
তারপরও একটি মুদ্রা উঠবে না নাওয়ে
ফাটা বেলুনের মতো হাওয়া পালিয়ে গেলে
দেহটা চুপসে যেতেই পরম-অপরম, মহাপরম
নোটিশ তুলে নেবে তোমার মহাল থেকে
তারপরও কেউ বুঝতে চাইবে না– মানুষ
পালাতে পারে তার দেহ নশ্বর করে দিয়ে!

যাও পাখি বলো তারে

মহানাগরিক দৃশ্যাবলি,
আমি শীতের গ্রাম থেকে তোমাদের বলছি।
আগেও কুয়াশার মাঠ দেখেছি
আবার কয়েক বছর পর নতুন করে দেখছি
তাৎপর্য লিখে পাঠাবো তোমাদের, আচমকা।

বিকালের মাঠ– কামিজে কমলার রঙ
মাঠে মনের, এই বলেই শেষ করা যেতো
যদি সকলেই হতবুদ্ধি হতো
আরো বলি, মেয়েটির পাখি জোড়া
অসহিষ্ণু, চমকপ্রদ, বাদামি ঠোঁট
তার মন-মনের প্রকারই প্রতিপাদ্য হোক

উড়ছে রঙের জাদু, নড়ছে বিস্ময়ের পাখি
ও পাখি বসো ঠোঁটে; অতল, লাগামহীন
একটা উড়াল দেবো তোমার অনর্থক বনে

পাহাড় আছে পাহাড়ির কাছে

০১

পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঘূর্ণি হাওয়ার চিত্রসখা
হৃদয়ের পথ ধরে নেমে আসে
জনপদ নেচে ওঠে তোমার চোখে
বৃক্ষলতায় জড়িয়ে নির্জন বোধ, জীবন থমকে
থাকার আয়োজনে মেনে নিয়েছ তারে
দিগন্ত থেকে মেঘ উড়ে যায় দূর পাহাড়ে
যেখানে মৌন আছে শতাব্দীর আগুন
পাহাড় আছে পাহাড়ির কাছে
তার দুঃখের পেখম ছড়িয়ে দিন-রাত্রি
যেন শ্রমের অশ্রুবিন্দু আর আগ্নেয় বিরতি।

০২

চূড়া প্রার্থী আমরা ক'জন
মেঘের আলিঙ্গনে রতিপ্রাপ্ত হই
আসমানের নিচে দেখা কালনিরবধি
চোলাই মদে মাখা ব্যক্তিগত বিস্ময়ের নদ
নক্ষত্রে পাঠায় চিঠি– নির্লিপ্ত অন্ধকারে
প্রসারিত বাসনার আলো
গুহামুখে দাঁড়িয়ে দেখেছি ঈশ্বরের ফসিল!
আহ, কী পরম!
নরম ফলের মতো বধূ
প্রতি পদক্ষেপে ঝরে রাতের নিনাদ

০৩

জুমিয়া আকুতির মাঝে এক খণ্ড মেঘ নাচে
মেঘ তার রতিমোহ নিয়ে চূড়ায় চূড়ায় দোলে
ধরে রাখে, চুমো খায় শৃঙ্গারের তুফান ওঠে।
একটু একটু করে খোলে তার মন্দ্র মায়া
এমন কামরূপ পত্রে পত্রে লতানো চারধার
কে জানে পাহাড়ে পাহাড়ে কত শৃঙ্গার!

০৪

উড়ো মেঘের আড়ালে দীপ্তমুখ সবুজ মহাল
সহস্রাব্দের গুঞ্জন লুকিয়ে তার প্রতিভার মধু
ছড়ায় রাতের আভায়
তখন বিহ্বল চারপাশ তরঙ্গিত পাখির ঠোঁটে
ছিন্নলতা কেবল মহাকালের যাতনা লুকায়
চারদিকে যারা ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থী
বহু মধুমুহূর্তে প্রার্থনায় ডুবিয়েছে অঞ্জলি
তাদের সংশয়ী বুকের ভেতর উঁকি দেয়
এই সবুজ শীত রাতের পাতা-পত্তর
দ্রুত মৌনতা ভাঙে গড়গড়ানো জলের শব্দে
শীতল জলের ধারা বুকে লাগে, ঘুম আসে আর
বিস্ময় জাগে– কার হাতে কে নির্মাণ ভবে!

০৫

রাতমন্থনে বগা লেকে নামে জ্যোৎস্নার ডাকঘর
যাদের ঠিকানা বদলায় আর বদলে যায় মতান্তে
তাদের সহস্র চিঠির বাণী ঘুরে এই রূপালি স্রোতে
সেই উত্তেজনাও লিপিবদ্ধ এই জ্যোৎস্নার মদে
যতিহীন জীবনধারায় যতদূর বোধনের পদাবলি
কোনো কোনো হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিগত নাম
পাহাড়ের ঢালে ঢেলে দিই স্মৃতির বৈয়াম।

০৬

পাসিং পাড়ায় মেঘ নামায় মুরঙনারী
থরে-বিথরে তার নির্জন ঘোর
ছড়িয়ে দেয় শরীরী বনায়ন
যার দাপুটে স্তনের খাঁজে পথ হারিয়েছি
চন্দ্রভেজা রাতে
কেওক্রাডং চুম্বন করে ফেরার কালে
ঝরে যাওয়া সব ব্যক্তিগত মরা পাতা
তুলে নেয় পাতা কুড়ানি ইতিহাস
জাদু পাই রোমানাপাড়া হাতছানি দিলে
ব্যক্ত হই সুতন্ত্র বনের বৈভবে।

ঋতু চুরি

০১.

হেমন্তেই লিখেছিলাম শীতের কবিতা
কিছুক্ষণ পরই তুমি শীতল হবে জেনে
কলুর বলদের মতো ঘুরেছি ঋতুচক্র
শেষ পর্যন্ত বলদও হইনি
হয়ে গেছি স্কুলের ঘণ্টি
আইতে এক বাড়ি যাইতে এক বাড়ি
কওছাইন হেমন্ত পুরুষ নাকি নারী?

০২.

বাতাসে আতর ছড়িয়ে কে যাও হে
আমি কুয়ায় পড়েছিলাম
আর শিউলী পড়েছিল
আরিচপুর প্রাইমারি স্কুলে
স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে আমি
তার প্রথম ঋতু চুরি করি

কবি চন্দন সরকারের খুনে আমার সমর্থন থাক

নদীতে পাওয়া গেলো কবির লাশ
কবি যদি নদীতেই খুন হলেন
তাহলে আমার সমর্থন থাক
কেননা কবি ও নদী অভিন্ন বহতা
চলে গেলেও ফিরে ফিরে আসে

এ শহরে আমরা যারা কবিকে ভুলে যাবো কিংবা
ভুল বানানে লিখবো তার স্মরণ সভার আমন্ত্রণ
স্মৃতিখণ্ডের আগুনে ঝলসানো বুক নিয়ে বাড়ি
ফিরতে ফিরতে হয়তো নদীটির কথাই মনে পড়বে
রাষ্ট্রীয় দড়ির সামরিক গেঁরোর পরও
যে নদী তলিয়ে যেতে দেয়নি কবির লাশ

মেঘপত্র

শরতের জন্য কোনো অভিনন্দন নেই
দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম তাকেই
ভরপুর রোদে ইতস্তত মেঘের অলক্ষে
সম্ভাষণের চাবুক এসে পড়েছিলো বক্ষে
বলেছিলাম আয় আয় যৌবনের গান গাই
তারপর কুহক ভেঙে দেখি কেউ নাই
উঠানে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে শূন্যমূর্তি
তাকে নিয়েই বালকবেলায় সে কী ফূর্তি!
কাশবনে ফেলে এসেছি কালো মেয়ের প্রীতি
তখনো জা-[;'নতাম না বিরহের চুক্তিই স্মৃতি
শরতের ইতস্তত সেই আসমান থেকে
কে যেনো মাঝে-মধ্যে মেঘপত্র লেখে

ভুবনের চোখে অশ্রু দুইফোঁটা

জমে উঠেছো ভিড়, নতুন কোনো দূরত্বে
দাঁড়িয়ে আছি একা;

পরমভাবের সঙ্গে মিশে অশ্রুবিন্দু হয়েছে চরাচর
সেইখানে বেঁধেছো ঘর
ঘুমবালিশে লেগে থাকা ছুরিখোলা রাত
তোমার জন্মজাত সখা
অপলক চোখের সামনে
ধূলি উড়িয়ে যারা উৎসবে গেছে
তাদের কল্যাণে কেঁপে উঠেছে পাথর দুইচোখ
জীবনের দুই বোন একা আর একা
শক্ত করে বাঁধো ভুবনের চোখে অশ্রু দুইফোঁটা

বিনাশী চাঁদের আলো ডেকে যায়

ও মনের মাঝিরে তুই পারিস যদি ছেড়ে যা
মনাগুনে পুড়ে পুড়ে তোর ছায়া তুই খা

এক ঢিলে তিন পাখি এই নিয়ে কিছু লিখি
কিছু একটা হয় না, হাতভরা নকল সিকি

আমাতে যে বসত করে, সময় মাগে দিন ভিখারি
ঘুমের মধ্যে পালিয়ে আসে রাতের কিরণ মুরঙনারী

ভবে আমার দেহতরী মহাজনের বন্দরে
পরমাগুন আহার করে মরা রিপুর অন্দরে

ওরে ভোলা দিন ফুরালি আত্মরূপের তালাশে
যাবার আগে জানিয়ে দিস মনমহলে কে আসে

বাংলাদেশ ২০১৪

আমার কৃষ্ণকলের ভেতর হাহাকারের পাখি
রাতের ঋতু ঝরায়
দিনের যোনিতেও টনটনে ব্যথা
মাকে বলি, অমিত জল ঢালো
মা আমার আঙরার মতো পুড়তে থাকে
আমি দৃশ্য দেখার জন্য দুটি দস্তার চোখ পাই

এরপর আগুনে মানুষের চর্বি পুড়তে দেখি
জয় বাংলা, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ-
তেড়ে আসে স্খলিত পোড়া মাংসের দিকে
তবুও আমি চোখ বন্ধ করি না
মাথার পচন হয়, চোখেরও হয়
তারপর গজিয়ে ওঠে রক্তাক্ত উদ্ভিদ!

মন্দিরা

বহু চেষ্টায় মুছে ফেললাম
তোমার শীতকলঙ্ক মাহফিল
এপাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম
ওপাড়ে আমি দৃশ্যমান

কী করে যে কেটে গেল
মানুষ ধরার কালচে ঘোর!
এখন আমি শূন্যমহলে
একটি করে মালা গাঁথি
চারদিক থেকে ছুটে আসে
মনহরনিয়া মন্দিরা

এখন তারে কেউ বাজায় না

সনাতন বটতলা

এই সনাতন বটতলার মরমি ছায়া
কোনোদিন বিলুপ্ত হলে
মুর্শিদের পিঠে সওয়ার হয়ে স্মৃতি বিতরণ করবো
এই আলের মধ্যে বসে আমি
লতা-ঘাসের সঙ্গে মিলিত হবো
আর প্রচুর ডিম পেড়ে ভরে দেবো
পুঁজিতন্ত্রের গোলাঘর
যারা পশ্চিমে গেছে, তাদের বলেছি যাও
যারা পুবে গেছে তাদের বলেছি যাও

যারা কোথাও যায়নি তাদের কিছুই বলিনি
কেবলই যারা নিজের কাছে যাও তাদের বলি– থামো
ওরা আমাকে হত্যার পর আত্মা বিক্রি করে দেবে পুঁজিবাজারে
কারণ আমি কারো কাছেই যেতে চাই না
এ সনাতন বটতলা ছেড়ে
এখানেই আমার মুর্শিদের স্বপ্নডুবি ঘটেছিল

আয়না ০২

তোমাদের তীব্র নখর আকাঙ্ক্ষার
রুটি হয়ে আমি ভালোই করেছি
কেমন ঘ্রাণহীন আমার দেহ
পোকায় খাওয়া গজবের মতো
এক থাল অনুতপ্ত মাংস

আমি একদিন হারিয়ে গিয়ে
ভালোই করবো
তোমরা ঠোঁট টিপে নিজেদের
ক্ষমা করতে পারবে
এতে পৃথিবীর কিছুটা ভার কমবে

তোমাদের বন্ধু না হয়ে ভালোই হলো
কাঁদতে কাঁদতে পাশ নিয়ে হেঁটে যাবো
তোমরা কোনো প্রশ্ন করবে না–

কান্না থেমে যাবে এই ভয়ে

যতির কাছে হেরে যায় গতি

মহিমা ছড়িয়ে বনে ফিরে গেছে কাঁটা
রক্তও ঝরবে না চিরকাল
কী এক শূন্যতা ঘুরে ঘুরে বাতাসে
ছড়ায় ফোঁটা ফোঁটা ঘোর
অনেক নির্জনে দমের ভেতর দয়াল

রূপক নয়, ভ্রম নয় অহেতু ভাবের মাহফিল।
সঙ্গমে সঙ্গমে আকার হারায় দেহ
মরমে ফুটে ওঠে পরম উল্লাস
তার স্মৃতির নিমজ্জনে অরূপ
যখন যতির কাছে হেরে যায় গতি
যাত্রাশিল্পী মহিম বলেন-
আপন উঠানে হাল দিলে শূন্যতা পালায়
শূন্যতা হারালে মানুষ হয়ে যায় হাটবাজার

কীটদষ্ট জল, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬, প্রকাশক : রাবেয়া বুকস
প্রচ্ছদ : রাজীব বাঙাল

আমাদের ছেলেবেলা

আমরা সাধারণ ঘরের সন্তান; শিশুকালে একটা লেবেঞ্চুষের
জন্য জিভে পানি নেমে আসতো, সেই পানি চেটে-পুটে তৃপ্ত হতাম।
তখন লেবেঞ্চুষ বড় বিস্ময়কর পাওয়া;
সবার হাতে ধরা পড়তো না।

শিশুকাল আমাদের অন্তর্দর্শী আয়না
সরিয়ে রাখলে কিছুই দেখা যায় না।

আমাদের চলা-বলায় একটা বুনোভাব থাকায়
সহেজই চেনা যায় আমরা গ্রাম্য; এই বুনো আমাদের
ক্ষয়িষ্ণু ক্রন্দনের ভেতর লুকিয়ে রাখে; আমরাও ক্রন্দনের
সঙ্গে বাঁচতে চাই বলে, বয়স বাড়লে লেবেঞ্চুষের
দাবি ছড়িয়ে পড়ে রক্তে।

সায়েদাবাদের সাথী হোটেল, তোতা মামার
ছাত্র ইউনিয়ন সব আছে
কেবল তোতা মামার প্রেম বিক্রি হয়ে গেছে
ত্রিশ হাজার টাকা যৌতুকে।
আরো কয়েক বছর আগে শুনেছি তোতা মামা মালয়েশিয়ায়
রাবার বাগানে কাজ করেন।
আমরা সাধারণ ঘরের সন্তান
আমাদের আধুনিক মন নেই, মনে হওয়াও নেই; তাই তোতা
মামার বিপ্লবী রাজনীতি ছেড়ে যাওয়ায় আমাদের কিছুই মনে হয়নি

আম্মা চিল হয়ে যেতে পারতেন

আমাদের আম্মা খড়-বিচালি আর পাটকাঠির
আগুনে শাক-শুঁটকি রাঁধতেন
হাওয়ার ঘ্রাণে ভাসতো ক্ষুধার্তের অভিলাষ; যতটা
সম্ভব চোখ বড় করে বলক ওঠা হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে

থাকতাম। এভাবে হাঁড়ির ভেতর আমাদের স্বপ্নজারি
হতো- ভাতের চেয়ে বড় কোনো স্বপ্ন ছিল না; এখনো নেই।

আম্মা বড় আগুন ঘনিষ্ঠ সংসার করতেন আব্বার সঙ্গে।
তিনি একটু ফুরসত পেলেই পুকুরপাড়ের
তেঁতুলছায় বসতেন; আম্মা তেঁতুলছায় বসে কোন ভাবনায়
তাড়িত হতেন, আমরা কোনোদিন জানতে পারিনি।
আমাদের এই অবিস্মরণীয় অজ্ঞতা এক স্বর্গীয় চেতনা সৃষ্টি করেছে।

আমরা আম্মাকে প্রাণখোলা মানুষ বলতে পারবো না।
তবে তার মধ্যেও একটা প্রাণ রয়েছে, এ নিয়ে আমরা
সংশয়মুক্ত ছিলাম। তিনি চিন্তাকে ডুকরে ডুকরে মাথা
থেকে পেটে, পেট থেকে বুকে জড়ো করতেন- এই বিরল
কর্মে তার সৃষ্টিগুলো আমরা চুষে খেয়েছি।
এ সময় আমাদের উদরপূর্তি হতো তার রক্ত-মাংস দিয়ে।

আম্মা যখন একা বোধ করতেন
আমরা বাষ্পের মতো মিলিয়ে যেতাম চারপাশে কিংবা
তার দীর্ঘশ্বাস পান করে আয়ুর পিঠে চড়তাম। যদিও ওই
একাকীত্ব কোনো দুরূহ ব্যাপার নয়, এক থাল
ভাতের মতো উদ্বুদ্ধকারী।

আম্মা চাইলেই চিল হয়ে যেতে পারতেন
কেন যে তিনি চিল হলেন না!
আম্মা এক সাধুর মোকামের কথা বলতেন, সেখানে নাকি
মানুষ মানুষের জন্য অপেক্ষা করে আর ক্ষণে ক্ষণে চিল
উড়ে যায় আরেক চিলের কাছে। আম্মা সেই উড়ন দৃশ্য
দেখতে দেখতে বিপন্ন হয়ে পড়তেন
এ সময় তাকে অচেনা লাগতো।

আম্মা তার খেলনাপাতিগুলো গামছায় বেঁধে আব্বাকে
দিয়েছিলেন, আব্বা সেগুলো কোথায় যে রেখেছিলেন আর
জানা যায়নি। তাই আমাদের খেলনাপাতির উত্তরাধিকার
বলতে পাশবাড়ির খেলা দেখা।

সহমরণে নাই

ফিতা টেনে চিহ্নিত করেছি ব্যক্তিগত নির্জনতা
এরপর আর কারো সঙ্গ মানি না
তোমরা যারা মাছ-ভাতের মতোই চাইছ আমাকে
মেথরের পাকস্থলী থেকে আমি
চিৎকার করে বলছি
ওই কাঁড়ি কাঁড়ি মুখাভিমান আমার দিকে
গভীরভাবে প্রস্তুত
এতে আমি বিব্রত ও হতাহত; আমার শিরাগুলোয়
মৃত্যু নেমে আসে
সামান্য বেঁচে থাকার জন্য একটু জনবিরান চাই
যাকে কেউ ছুঁতে আসে না-
ওই মেথরের পাকস্থলীই আমার বাণপ্রস্থ।

সর্বপ্রাণ

পাতা আর পাতা
তারা সম্পর্কে কী
ঘাসের সঙ্গে জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়লো রোদ
তারে বা কী বলি
মায়ের গালে যে টোল দেখেছিলেন বাবা
তার নামও প্রকৃতি
মানুষ সেখানে এক প্রকারের বনায়ন
যেখানে অন্য কিছুরাও আছে।

প্রকল্প

আমার প্রেমিকা নিলে তুমি
তোমার প্রেমিকা নিলাম আমি
এরপর চললো বউ বানানোর মহড়া
মরণপণ প্রতিযোগিতায় সকল পক্ষ
পাটকাঠি আর বাঁশ সংগ্রহে ব্যস্ত

ঘর বানাতে গিয়ে বাঁশঝাড় উজাড়।
বাঁশ আমাকে দিলে তুমি, আমিও তোমাকে।

একদিন তুমি একটা নাদুস-নুদুস বউ বানিয়ে
ফেললে। আমি বানালাম নাটাই-ঘুরি।
এতে তোমার অনেক বাঁশ-কাঠি লেগেছে।
আমার লেগেছে আসমান ভরা বাতাস।
সবকিছু কাটাকুটি শেষে
আমাদের হৃদয় এখন মনিহারি দোকান
কে গেল, কে এলো– সবই মুদ্রায় প্রমাণ।

ফিদেল

এক সঙ্গে বসে ভাত খাওয়া হয়নি আমাদের
দিন শেষে আমি তুমুলভাবে বুঝতে পারছি
এ দেশের ভাতের হাঁড়ির পাশে তুমি ছিলে
আগুনের সন্ত
তোমাকে নিয়ে ছেঁউরিয়ার আখড়াবাড়িতে
ভাবচঞ্চল সন্ধ্যায় বেড়ানোর কথা ছিল।
রাত জেগে শুনতে চেয়েছিলাম বেহুলা-লক্ষীন্দর।
কোনো এক কৈবর্তকন্যার কথা মনে আসে,
তোমার কথা তুলতেই বলেছিল–
ওহ! সে এক মস্ত প্রেমিক।

বোধোদয়

আমি তোমাকে মুখ দেখাই, তুমি দেখাও
মুখের মতো একটা কিছু
এতে আমার ভ্রান্তি বাড়ে দূরে ও কাছে
শহরের এই সালতামামি প্রতি বছরই আসে।
স্মৃতি দিয়ে মুখ ধুই আগে-পরে যত

আসলে ঠিক মুখ হয় না মুখের মতো
ঘুমিয়ে আমি অল্প দেখি, জেগে দেখি না কিছুই
মানুষ দেখা হয়ে গেছে, এবার দেখবো বাবুই।

দাউ দাউ করে জ্বলছেন যিনি

বাবাকে খুঁজি
টিকেট কাউন্টারের কোলাহলে, যাত্রাপালার
নেপথ্য বচনে, জিলাপি দোকানের আশপাশে
নাপিতের ক্ষুর-কাঁচিতে, হাওয়ার উল্টোদিকে
কোথাও পাওয়া যায় না তাকে

আমাদের বাবা
ক্ষুধা-মন্দায় বসেও গলা ছেড়ে গাইতেন;
আসর বসিয়ে রাতভর জাগিয়ে রাখতেন গ্রাম।
এই সব ভাববৈঠকের চারদিকে ঘুরতো
জীব ও পরমের স্বরূপ সন্ধানীবলয়
দোতরা খঞ্জনি খমকের তালে মুর্শিদের
আসন কেঁপে উঠতো
সেই রাত্রির মহিমায় আত্মার আলোকে
খুঁজছি বাবাকে
অনাড়ম্বর স্মৃতির বিবরে দাউ দাউ করে জ্বলছেন যিনি।

স্বপ্নবধের বিদ্যা

হেমা কৈবর্ত তার জোয়ান পুত্রকে স্বপ্নবধের বিদ্যা শিখতে বলেছিলেন। হেমা কৈবর্তরা এ বিদ্যা আয়ত্ত করতে জীবন চুলায় দেন। এরপর পুড়তে থাকেন। এভাবেই কৈবর্তপাড়ায় চন্দ্র-সূর্য পার হয়।
আমাদের গাঁয়ের ওই পাড়াতেই জন্মেছিল বাল্যবন্ধু কৃষ্ণা। সে তার স্বপ্নবধের কথা আমাকে বলতে চেয়েছিল। কৃষ্ণা যে বছর ভিটি ছেড়ে কলকাতা চলে যায়, সে বছরই জিয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা বলে ভোট চান বিচারপতি সাত্তার।

আমাদের এখনো জানা হয়নি জিয়ার স্বপ্নটা কী, জানা হয়নি বন্ধু কৃষ্ণা কেন দেশে ফিরে এসে আমাকে তার স্বপ্নের কথা বলতে পারেনি।
জানি না, হেমা কৈবর্তের জোয়ান পুত্র স্বপ্নবধের বিদ্যা শিখলে ফসল ওঠে কার ঘরে।

তোমার আলোকপ্রাপ্তি ইতিহাসের হেতু নয়

এবার তুমি একটি স্মরণার্থী শিবিরের কাছে পৌঁছে গেলে। তোমার উদরপূর্তি নিয়ে সন্দেহ অনেকের। তুমি একটা অস্বস্তি বোধ করছ। আলো দেখছ না। অন্ধকারে ডুব দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভের মতো শীতল জনসম্পদ হয়ে গেলে। তারপর থেকে আমরা কাঁড়ি কাঁড়ি অন্ধকার দেখলে ক্ষুধামন্দায় ভুগতে থাকি। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে পাক খেয়ে পড়লাম আরেকটা পাকের ভেতর। বুঝলাম, এবার পেকে উঠবো। আসলে না। একটা ধুলার পথ শুরু। প্রস্তর যুগে যারা আগুন এনেছিল, তাদের চোখে ছিল আত্মার সুর। তোমার চোখে যারা আলো মাখিয়েছে, তারা প্রতিবেশী। এভাবে তোমার আলোকপ্রাপ্তি কোনো ইতিহাসের হেতু নয়।

উন্নয়ন প্রসূত চমকের দিকে

পুরনো ঘড়ি, একটি বেওয়ারিশ কাঁচামরিচ এক সঙ্গে রেখে ছবি তুললে। তারপর পানির সঙ্গে চিবিয়ে খেয়ে বললে– চমৎকার। একটু দূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য যে দেখলো, সেও বললো– চমৎকার। যে দেখলো না, সেও বললো। আরেকটু সামনে গেলে। এবার নামি-দামি গাড়ির নম্বরপ্লেটের ছবি তুলে আগের নিয়মে খেলে। একটি কুমুদ, আব্বু-আম্মুর কাবিননামার সঙ্গে সেলফিও খাওয়া শেষ।
খেয়ে-টেয়ে তুমি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভের মতো শীতল জনসম্পদ হয়ে গেলে।
আর আমরা তোমার ভোজ্য তালিকাটি পাঠ করে মনে করবো উন্নত বিশ্বের শর্তায়নে কোনো সিনেমা দেখছি! যাতে অভিনয় করছে ইচ্ছাপূরণের টেপাপুতুল।
ওই সিনেমাটি খাওয়ার জন্য বসে আছেন থুত্থুড়ে এক বুড়ো মানুষ। তার চোখ ফুলে ওঠা লাশের মতো ক্ষুধাবিমুখ।

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা

২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে চঞ্চল বাড়ি থেকে বের হয়। সেদিন কিংবা পরের দিন এক মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা ছিল। গেছে কিনা জানা যায়নি। এও জানা যায়নি, সপ্তাহখানেক আগে শহরের বর্জ্য টেনে চলা নদীটায় তার লাশ পাওয়া যাবে। শিল-পাটার মতো বুক ছিল চঞ্চলের। বুক থেকে কোমর পর্যন্ত লাশটি ফাঁড়া। উঁকি দিয়ে দেখতে গেলে আমার একটা চোখ ফুড়ুত করে ফাঁড়া দিয়ে ঢুকে পড়ে। সম্ভবত আমি চোখটা টেনে বের করার চেষ্টা করছি। এমন সময় চঞ্চল আমার ঘাড়ে হাত রেখে বলে- আগে তো ভেতরটা দেখিসনি, এখন দেখ।

হায় আল্লাহ! আমি এ কী শুনলাম!

বাইচ

মুহাম্মদ মুস্তফা তার আবাদ করা পাট ক্ষেতে পাটপাতার কান মলে দিয়ে বলে, তোরা আমার সব খাইলি- এখন তড়তড়ি বেড়ে ওঠ।

তার এই নির্জন তাড়নায় পাটচারাগুলো যেন দ্রুত বেড়ে ওঠে। পরের দিন নোয়াব আলীর ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা বুঝতে পারে নিজের ক্ষেতের পাটের চারা লায়েক হয়ে উঠছে।

এতে সে তার চাওয়া-পাওয়ার একটা বুঝ পেয়ে যায়। এমনকি কিছুটা পেছনে তাকাবারও ফুরসত হয়- যে বছর সে যাত্রাপালার নায়িকার একতরফা প্রেমের টানে রাতে যাত্রা দেখতো আর দিনে প্যান্ডেলের পাশ দিয়ে ঘুর ঘুর করতো, সেবার পাটের বাজার পেয়েছিলেন তার বাবা মুহাম্মদ খবির উদ্দিন। তাই জামিলা খাতুনের সঙ্গে বিয়েটাও পাকা হয় তখন। এরপর জামিলা খাতুন তার আবদারের কিছুই বাকি রাখে নাই– এই মূল্যায়ন শেষে মুহাম্মদ মুস্তফা ক্ষেতের আল থেকে উঠে সোজা রওনা দেয় উত্তরের বিলের দিকে।

ততক্ষণে সূর্যটা বিস্তর লাল হয়ে আজরাইলের খাবলার মতো দেখাচ্ছে। মুহাম্মদ মুস্তফা দেখলো তার সামনে-পেছনে দুইখান খুঁটি। তাকে হয় ডানে, না হয় বামে যেতে হবে।

জল্লাদের পরিপত্র

আমাদের মা-বাবা, আমাদের বোন
যে কারো নামই সুন্দরবন
জলজ বীজে পাতা-পত্রে গড়েছি শোণিত
কী করে ছাড়াই আমার কান্নারও অতীত।

জল্লাদের পরিপত্রে
পুড়ছে বাতাস অরণ্যের স্মৃতি
যারা চাইছ না বুনো গন্ধ বৃষ্টি বাতাস
তোমাদের হৃদয় পাঁজরের দাস
মানুষ পুড়লে অঙ্গার হয়
অঙ্গার পুড়লে হয় না মানুষ
বন পুড়িয়ে আলো চাইছ
আলো পুড়িয়ে পাবে না বন
আমাদের মা-বাবা, আমাদের বোন
যে কারো নামই সুন্দরবন

ভবে মোর দেহতরী

পাথুরে পিন্ধন উঠাও, দেখাও দরিয়ার শুরু
এইখানে অনলে নেমে গেছে অতসী নারী
বর্ষণে কর্ষণে মহিমা সিঞ্চন করো; ডোবাও
রতি ওঠা মাথা
একবার, পাঁচবার, সাতবার তুঙ্গে ওঠা শরীর
আলগোছে নামিয়ে রাখো অন্তরে
ভবের বাতাস মাখাও তারে
যেভাবে শুরু দুই দেহে এক মাহফিল।

কোনকালে কে ছুঁয়েছিল এই আদি রঞ্জন, বিবাদীর রিপু
লোকায়নে ছড়িয়ে গেছে তার তূরীয় নন্দন
নির্মাণের অমোঘ আগুনে চুম্বন করো পরমেশ্বর
তারপর স্মৃতি হারিয়ে তার আসনে বসো
কোনো প্রকার সন্ধিবিহনে ফুটাও ফুল শত শত।

জীবনব্যাপিয়া বাঁচো

মরণেই বেঁচে যাবে তুমি
মিছে মিছে মৃত্যুভয়ে ছুটছো
তোমার পেছনে নেই ইশারা
সামনেও না
তবুও মরণ তোমার
দুই নয়নের একটি।

বেঁচে থাকার সব ব্যাকুলতা
তোমাকে পাথরে বসিয়েছে
সেই পাথরও নেমে গেছে দরিয়ায়
তুমি এখন দরিয়াপাড়ের নির্জনতা
দু'হাতে ধরা ফাটা চাঁদ
মাথায় ভরেছ মৃত্যুর ওম।

যারা তোমাকে মরণতাড়নায়
সেলাই করছে
ফালি ফালি করছে ঘুম
তাদের সুবর্ণ ঘাতে
তুমি আর জাগবে না
জাগবে না তোমার মৃত্যুও।

চোতা

বেগুনি সন্ত্রাসে অনিশ্চিত দলন
তুমি, আমি, আমাদের গা পৌরাণিক চোতা
যা থেকে মনে করতে পারি হাটবার ও হাটের প্রলাপ।
কতো পদ কাটা-ছেঁড়া হয়, যুক্ত হয়
তুমি, আমি, আমরা পণ্য মোড়কে খুঁজি পড়তা।

খুঁজি না গড়পড়তা। কেননা গড়ের কাছে আমার
অনেক ঋণ, তারও কান-মাথা আছে, তারও শ্রম হয়
পরের কথায় কান ভারী হয়, মৃতের মতো নিষ্কণ্টক ঘুম হয়।

আমাদের যেমন প্রতিবেশীর স্ত্রীর লাল ঘাড় দেখে লোভ হয়
তার বেগুনি সন্ত্রাস দেহের ওজন কমায়, বুদ্বুদ ওঠে
বাজারের তালিকা ঝোলানো শরীরটায়
খুদ্রঋণের কিস্তির মতো মুঠো বদল হয়।

শীতমাসে

শীতমাসে কোনো কথা দেবো না
নিগার সুলতানা, ফাহমিদা খালা
উভয়ে ছড়িয়ে যাবো সমান কামনা
শুনবো বিচিত্র টিলার গুনগুন
সকালে ডালে, বিকেলে পাতায়
অন্য ঘাটে অন্য জলে
স্নানের আদিম বাসনা
গড়িয়ে যাবে রূপসী আবর্তনে।
শীতমাসে কোনো কথা দেবো না
পাথর ছেড়ে পাথরে যাবো
ইঙ্গিতে পেলেই
ছেড়ে দেবো হাতের বিশ্বস্ত মুঠি

পাতার কোলাহল, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭, প্রকাশক: রাবেয়া বুকস, প্রচ্ছদ : মামুন হোসাইন

মায়া ০২

গৌরাঙ্গদা
পাখিও প্রকৃত পাখি না
পাখি হচ্ছে যার যার সাবিনা
একবার ডানা মেললে আর ফেরে না
সাবিনা এখন প্রতিবেশীর ফসলি জমি

গৌরাঙ্গদা
তুমি কি একটু রামায়ণ শোনাবে
এই মন্থরে
যখন আমার চিবুকে
মৌন ধনেশের কবর জেগে উঠছে
আর আমি কাঁধে করে নিয়ে
যাচ্ছি নিঃসঙ্গ উতলা এক ধানক্ষেত

ব্যথা ও মার্কস

কৈবর্তকন্যা পূর্ণিমা
মার্কস পড়েন না
শুধু জানেন ঋতুকালে ব্যথা হয়
এই ব্যথা ছড়িয়ে যায়
হাড্ডির গহিনে
মেয়ে মানুষের এমনই হয়
বলেন তার বইনে
বইনও মার্কস পড়েন না
কৈবর্তপাড়ার কেউই
মার্কস পড়েন না
উদ্বৃত্তমূল্য নিয়ে তাদের
ভাবনাও নেই
যারা পড়েন তাদের হাতেই

রয়ে গেছেন মার্কস
যাদের হাড্ডিতে ব্যথা নেই
মার্কস তাদের সার্কাস
ব্যথা আর মার্কস একসঙ্গে হলে
উদ্বেলে আগুন জ্বলে

লেনিন ধান কমরেড ধান

মাঠে মাঠে
লেনিন ধান কমরেড ধান
দুনিয়ার মজদুর একজান
মার্কস লেনিন বোরো ধান
ঘরে ঘরে লেনিন ধান
লাল লাল ফকিরি
তোমার সঙ্গে আমার
আমার সঙ্গে তোমার
লালের ছড়াছড়ি
প্রচুর ফলেছে ধান
ফলেছ লেনিন
তবুও পেটের ভেতর
কামড় সঙ্গীন
ভোর হলে ফের লেনিন
ক্ষেতের ধান কেটে দিন

নাগরিকপঞ্জি

আম জাম পুকুর থেকে আসিনি কি?
আসিনি কি দুপুরের মন্থরে বসা
ফড়িঙের চিড়ল মৌনতা থেকে!
তোমরা যে বলো- মাইক্রোসফট করপোরেশন
আর খোলা বাজারের নন্দন স্কুলে স্কুলে দেবা!
তোমরা যে বলো- তিন মাত্রা, চার মাত্রার

চোখ বানাবা আর বাঘা-বাঘা চিন্তা দেবা!
এসব দিয়ে আমি কী করমু
একটা বল্টু হয়ে রাষ্ট্রমেশিনে থাকমু!
নাকি হিন্দু-মুসলমান একলগে কইরা
একটা ইস্টিমার ভাসাইয়া দিমু?

ইলিশ

শূন্যপ্রায় গরিব ফ্রিজ
দুই মাস অপেক্ষায় ছিলো
অর্ধেক ইলিশ

কচু কেনা যাচ্ছে না
দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে
হঠাৎ খোলায় উঠলো
মলিনপ্রায় ইলিশটুকু
এমন সময় বাইরে
কচু বিক্রেতার হাঁক!

না, থাক
অন্য কোনো সময়
মিলবে সাধ ও সাধ্যের ফাঁক

জ্বরে পুড়ছে দোকানি

কেউ বেচে দেন নদী
কেউ বেচেন বোটাছেঁড়া বকুল
নিজের ছায়া বেচতে পারেননি
দুর্গাপুরের আজিজ
কত রকম তেল ও নুনের বাগান
সূর্য ওঠার আগে-আগে সূর্য ডোবার
আগে-আগে আরো কত জলপাই বিস্কুট
আমাকে ও তোমাকে বানালো
গণতন্ত্রের চিরকুট।

তাকেও বেচে দেয়া যায়
সময়ের চলতি বিভায়
যখন কেউ আসে হাতরায়; বনের ছায়া
ধরে ফিরে যায়
হাটের একপাশে বসে
সারা বছর ব্যাকরণ খায়
তারে বেচে দিয়ে কোন্ অমঙ্গলে
যাবে তুমি একটা মরা বৃহস্পতি ঠেলে!

উৎপাদন প্রণালি

রঙ ছড়িয়ে যায় উদ্ভিদ
বাতাসে তার সঙ্গমের ক্ষুধা
শেকড়ে নাচে
বিস্কুটের বেকারি

কৃষকের বর্গা জমিতে
দাঁত চোয়াল ও মরা কাকের চাষ
সাপের আঙুল ধরে উঠে
আসে অভুক্ত বিদ্যালয়
তারা চিবিয়ে খায় শিশু ও
শিশুর বাপ-দাদা

জবানবন্দি

প্রাণের ভেতর গাছ হয়ে ওঠা
শত রকম বাঁকা-সিধা গাছ
আতাফল, ছাতিম কিংবা বুনো
গহনপুরে পাতাকাণ্ড ভরা কোনো
নির্লিপ্ত শিকড়মণ্ডলী
উনুনের আগুন গণনা করে
যতো গাছ পুড়ে গিয়ে পয়গম্বর হয়

তারও অধিক পুড়ে হয় মুনাফা
যেনো আমারই সন্তানের মুঠোয়
মুচড়ানো তার বাবা।
যতরকম তুলসি-তেঁতুল হত্যা
পড়ে থাকা রক্তের ভঙিমা নিয়ে
পাখিবিদ্ধ পরম্পরায় কুঠারে
কুঠারে সংহার উদ্ভিদের পাঠশালা
বয়োজ্যেষ্ঠ গাভীর কাছে পাওয়া।
তবুও অলিন্দ বানাও অর্গল বানাও
বানাও ছায়ার মৃত্যু; অবলিলায়
মেঘ দোকানি, গাছ দোকানি
পাখি দোকানি তুমি
ইচ্ছা মৃত্যুর দড়ি হাতে গাছতলায় যাওনি!

ক্রমবিকাশ

একটি বাগডাশ আরেকটিকে সংহার করতে দেখিনি
অন্ধকারে তাদের সঙ্গম হতে পারে;
হতে পারে আলোয় ভরা দিনেও
তাদের কেউ মূক, মূর্খ থাকলেও আমার যায়-আসে না

এখানে একজন মানুষ থাকলেই আমি পালাতে চাই।

আগুনলাগা চোখের কাজ

আগুনলাগা চোখের যমজ
পুড়ছে সরল অরণ্য
পলক ফেলো দোহাই দিলাম
গাজী-কালু, পীর-ফকিরের
দোহাই তোমার ঋতুলাগা মন্দ্রক্ষণের

চোখের ভেতর ভাবের হাট
সেই হাটে শালিক নামে
তার পায়ে পাঁজর বাঁধা, পাঁজর আমার

ঘাসের মাঠ

চোখের ওপর মৃত্যুকলা
থরে থরে খেলা করে, চূর্ণ হওয়া রিপুকণা
লতা-পাতায় নিঃস্ফলা।
আমি একটা গাছমানুষ
ফল ধরেছি হতভম্ব
কার রক্ত ভেঙে ভেঙে খুন ফুটেছে অন্তরঙ্গ

চোখের একটা শোষক ঘোর
রক্তবীজে চুম্বন করে
অভিমানে চোখের ছলে
বিকিয়েছো মনোভূমি
বন-বাদাড় সবই আজ আগুনলাগা চোখের কাজ

যে রাতে পাকুড় কাঁদে

যে রাত জেগেছিলাম
তার ভেতর ছিলো পাকুড়ের কান্না
যে সময় বয়ে ছিলাম
তার ছিলো না কোনো প্রেম
মলিন হাঁড়ের ঘোরে সময় গোপন করেছি।
আমার চারদিক বুনো ঘাস লতানো ছিলো;
রক্তশূন্য দেহে গড়িয়ে গেছি
তোমাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

আমার সর্বাঙ্গ গাছে পোঁতা ছিলো; বসন
ছিলো নির্জন বন
মানুষের ক্ষিপ্র চোখের ভেতর শুধু
দস্তার তুফান দেখেছি।

মনুষ্য আলো নিভিয়ে এখন
উদ্ভিদের নির্জনতা দেখবো।

ডুমুরগাছ

আমাদের পাড়ার ডুমুর গাছটি এখন
চুম্বন করে আছে কোটি কোটি ডুমুরের মৃত্যু!
ডালপালা ঘিরে চলছে অবাঙ লকডাউন
পাতার ফাঁকে ফলিতেছে অজস্র নিথর ডুমুর
কত-কত রাত, কত-কত দিন এই পাড়ায়
কুসুমচাপা অভিমান ছুঁয়েছিলো
ব্যক্তিগত মৃত্যুর অমর মৌনতা
সেও হারিয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার
কবরের কোলোহলে
সন্তান যদি ছুঁয়ে না দ্যাখে মায়ের মৃত্যু,
স্ত্রী যদি বুজিয়ে না দেয় স্বামীর শীতল চোখ
কোন্ যম এসে তরজমা করবে এই শোক!
সকল দেশে একক ভাষায় মৃতের আলাপ
ঘরে ঘরে ছড়িয়ে যাচ্ছে গণমৃত্যুর তাপ
এতো এতো মৃত্যুর সৎকার
একাই পারবেন তো ঈশ্বর!

লকডাউন

তুমি সাঁতার না জানলে
এমনিতেই নদী লকডাউন
হাঁটতে না পারলে পথও
নাগরিক চিত্তে নিজের ছায়াও
কোয়ারেন্টিন।
তীরবর্তী মানুষ,
কারা সাঁতার জানো না
কারা খর্ব হয়েছো পদে, ডানায়
আমি তোমাদের একজন
জীবনভরই ব্যক্তিগত লকডাউন
এই খর্বায়ন কবে আমার মা হয়ে গেলো;

পাঁজর ছেঁটে ফেলা এই সভ্যতা
কী করে আমার বাবা হয়ে গেলো
তীরবর্তী মানুষ, ডাঙায় লকডাউন
নদীতে সাঁতরাও, তবুও বাঁচো
তুমি না বাঁচলে সবকালেই
আমি লকডাউন

করমর্দন

হাত না মিলিয়ে চলে গেছি বন্ধু
জানি না এই যাওয়া শেষ কিনা
যদি থাকো বন্ধু জমিনে দাঁড়িয়ে
কাট-ছাঁট জীবনের মন্থর ভোরে
আমার না ফেরা আত্মায় দিও
বৃষ্টি ছড়িয়ে
তাদের দিও আমার চোখদুখানা
যারা নদী ও পাহাড়ের মৃত্যু দ্যাখে না
আমার সবগুলো আঙুলে গাছ লাগিয়ে
ফলগুলো দিও সেই শিশুদের– যারা
করোনায় অনাথ হয়ে
বুকে ফলিয়েছে পাথর
তোমার আমার শেষ দেখা বন্ধু–
দুই কাপ রঙচা
একটায় চিনি, অন্যটায় না
এরপর কখনো জামার আস্তিনে
একা একা চোখ মুছবো না

ভাত

মৃত্যু কত গভীর জানি না
তবে সেখানে পড়ে গেলেও উঠে আমি
ভাত খেতে চাইবো

সর্বেশ্বর ক্ষুধা আমাকে এই অমরত্ব দিয়েছে
তিন বেলা থেকে দুবেলার পর একবেলা
আমি সেই উৎকর্ণ বক–
ভাতের বিলের দিকে গলা উঁচিয়ে আছি
সবখানে ভাতমন্ত্রী ভাতসরকার
ভাতমানুষ দেখি
জানি না ওই ধবধবে সাদা ভাতের
জন্ম-মৃত্যু আছে কিনা
সে কারো কাছে ভাতউৎসব কারো কাছে
মৃত্যুপরোয়ানা
বাহুবলী পৃথিবীর পলে পলে ক্ষুধার ক্ষত
গোলাপের ভেতর আরো এক গোলাপ
ফুটে আছে যেনো– অর্থহীন ব্রত
কেউ দ্যাখে কেউ দ্যাখে না
ভাতশালিকের দীর্ঘশ্বাসের মতো

মৃত্যু

আমি সব মৃতদেহ ছুঁয়ে দেখবো
তাদের মৃত্যু না হত্যা হয়েছে
সব মৃত্যুতে ঈশ্বরের অনুমোদন
ছিলো কিনা তাও দেখবো
তার আগে তোমরা আমাকে
মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে দাও
মৃত না হয়ে মৃত্যুর অভিজ্ঞান
পাওয়া যায় না
খুঁজে দেখবো মৃত্যু কোনো
সাধারণ ভাতঘুম কিনা
নাকি উদ্ভিদের উপলব্ধি; যাকে
তোমরা হিসেবেই রাখছো না!
আমি রাত-দিন সন্দিহান
কোনটা মৃত্যু কোনটা হত্যা;

বৃষ্টির মতো মৃত্যু ঝরছে
বৃষ্টির মতো হত্যা ঝরছে
কোথাও অনুতাপ নেই
একটি শোককৃত্যও না
মৃত্যুরও একটি মতবাদ আছে
যা আমার পিতামহ তার
সন্তানে দিয়ে গেছে
আমি পেয়েছি তার কাছে
এখন তাকে দেখছি মৃত্যুসমষ্টি
নিয়ে ঘুঙুর পায়ে হেঁটে যেতে
আমি তার আগেই যেতে চাই
তোমরা আমাকে মনুষ্য পথে
মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে দাও

লুৎফার মা

করোনা বোঝে না লুৎফার মা
শত মানুষ মরে লাখো মানুষ মরে
মরে না লুৎফার মা
প্রচুর ঘাসের দেশে ভরপুর বাঁচে
লুৎফার মা; মৃত্যুর আঁচে আঁচে
গরু ছাগল মুরগি নিয়ে বাঁচে
জটাধারী আকাশ মাথায় ভরে হাঁটে
ত্রাণ-ট্রানের তোয়াক্কা করে না
লুৎফার মা
প্রয়োজনে পেটের ক্ষুধা মাথায়
টেনে তোলে– সেই মাথা গাছের
সঙ্গে ঠোকে– এক সময় ক্ষুধা মাটি
হয়ে যায়– সেই মাটিতে জন্মে ঘাস
গরু ছাগলের সঙ্গে ঘাস খেয়েই
বছর বছর বাঁচে লুৎফার মা

বাঁচার ছলে মাঝে-মধ্যে চুলায়
হাঁড়িতে পানির বলক ওঠে
ভাতের বলক দেখে দেখে মরার
কথা ভুলে যায় লুৎফার মা

হবুমানুষ

অমরত্ব হারাবো কি আমি
নিজের চোয়াল বলবে কি ডেকে, থামো এবার!
ঢোলকলমীর পাতায় পাতায়
ছড়িয়ে গেছে জখম আমার
ছড়িয়ে গেছে মিষ্টি কুমরা, লাউ, ধুতরায়
প্রতাপশালী কৈ-কাতলায়
আমি এখনও হবুমানুষ
গ্রহত্র হামাগুড়ি দিয়ে জমা করেছি
গুটিকয় পুস্তক, সামান্য বোমা আর
মৃত্যু-সংস্কৃতির আবশ্যকীয় স্বর্গ-নরক
গাছতলা দিয়ে হেঁটে গেলে
পাতা ঝরে পড়ে পায়ের সামনে
আমি ভাবি– তার পতন হয়েছে
ভাবি না– সে পতনের শিক্ষা হয়ে এসেছ।
এভাবে আমি প্রকৃতি থেকে আলাদা
হয়ে হই, ভুল বার্তা পাই
আলাদা হয়ে যাই নিজের প্রকার থেকেও
যে প্রকারে এখনও মানুষ হয়ে উঠিনি
প্রকৃতির সঙ্গে একটা চুক্তি ছিলো আমার
মানুষ হয়ে ওঠার

ত্রাণ

কে রক্তাক্ত করলো বাতাস
বঙ্গভবনের পেছনে দেখালাম অনেকগুলো
ত্রাণের নৌকা বাঁধা

তার উপর চক্কর দিচ্ছিলো কাড়িকাড়ি কাক
কাকের ওপর কে ড্যাগার ছুড়ে মারলো
আর বাতাস এমন রক্তাক্ত হলো
রক্তমাখা বাতাসে দম নিতে নিতে
ভেতরে বাইরে লাল হয়ে ওঠা কাকগুলো
চারপাশে ব্যাপক লাল পালক ঝরাতে লাগলো
তখন ত্রাণের নৌকাগুলো
মতিঝিল শাপলা চত্বর পার হয়ে
কোথায় গেলো কেউ দেখলো না

বন্দনা

আমার হাতের নাম জলপিঁপড়া
নখের নাম বুলবুলি
পায়ের নাম বট-পাকুর
জিহ্বার নাম পাটখড়ি।
আমার চোখের নাম পুঁটিমাছ
ঠোঁটের নাম মগডাল
বুকের নাম ধানক্ষেত
মনের নাম কাশু ঢুলি।
আমার ত্বকের নাম জ্যৈষ্ঠমাস
সুখের নাম অন্ধ গায়ক
হৃদয়ের নাম কোষা নৌকা
বিশ্বাসের নাম পুঁইশাক।
আমার মাথার নাম কড়ুইতলা
কপালের নাম ধানদূর্বা
কলঙ্কের নাম খালপাড়
যৌবনের নাম পুতুলনাচ।
আমার শিক্ষার নাম কাচাসড়ক
প্রেমের নাম ডুবুচর
দেশের নাম লালন ফকির

সরকারের নাম সৃষ্টি-বন্দনা।
আমার জামার নাম পথশিশু
ইচ্ছার নাম খোদাই বাছুর
শিক্ষকের নাম খরা-বন্যা
দুঃখের নাম সুন্দরবন।
আমার ঘুমের নাম বর্ণমালা
চিৎকারের নাম ভাতউৎসব
দ্রোহের নাম পলোবাওয়া
স্বপ্নের নাম যদু-মধু।
আমার পরাজয়ের নাম কালো মেয়ে
জীবনের নাম গাঙের কিনার

অগ্রন্থিত

নেই
খাতা-কলমে নেই আমি

তবে কোথায়?

যেখানে কেউ নেই
উদ্দেশ্যমুখর লালা কুড়ানো
সন্ধ্যায় ফিঙে দেখার দুটি চোখ
কাউকে দেখে না
সেথায়?

মঞ্চে পদে পুরস্কারে
কাকতাড়ুয়ার ছায়া
ছড়িয়ে পড়েছে
সবার অলখ্যে
চোখ মুছে
সরে পড়েছি
সংঘের বাতাস ছিদ্র করে

মানুষ বেহাত

একা আর কেউ নয়
যার সঙ্গে কেউ নেই- সেও নয়
যার সব গেছে- সেও নয়
একা- সরল সোজা ঠেলে
দেওয়া ভিক্ষুকের হাত
যার কোনো করমর্দন নেই
বেহাত মানুষ

মুদ্রা ও ক্ষুধার জাগরণ

০১.

ঘুমন্ত ডাহুক বাজাবো এবার
বেহুলার বহর দেখবে হাঙরেরা
বিল-ডোবার হাঙরেরা উঠোনে নাচবে
আর মুদ্রা পড়বে শহরজুড়ে
মুদ্রা কুড়াবো আমি, চারবেলা চাক্ষুষে
পান করবো তারে, দানবাক্সের মতো
চেটে চেঁছে শূন্য করে আবার জমাবো
শরীর থেকে ঝরবে অক্ষয়, অলক্ত কাম
তার ভেতর ছেড়ে দেবো গোরের ধূলিবাস

০২.

ঋতুস্নাতের ঘ্রাণে মাতাল আষাঢ়ে জ্যৈষ্ঠে
ডাকো না তুমি এই ফসলহারারে
শত শত বিঘা জমি কান্দে বাতাসে বাতাসে
কান্দে না তোমার মন
জানি বন্ধু জানি, মুদ্রার ফোলা ফোলা স্তন
সোনালি ধানের মতোন

ঢেউ তুলে ফেরে- আর মাথা তাড়িয়ে জাগায়
গহিন কামরাঙাবন।
বিদ্যাহীন, রুদ্রহীন নবীনতর ক্ষুধা ফোটে
অগণন তারার জটে
ক্ষুধার আয়োজন করবো এবার সমুদ্রতটে
আসমুদ্র ক্ষুধা চিবিয়ে শত শত সাবমেরিন
ছুটবে তোমার ঘুম বরাবর
তুমি জাগবে মৃতপ্রায় অগ্নিগোলকে
হাঁড়কামড়ানো ক্ষুধার হীরকে

আমার ডান দুঃখ

আমাকে খুঁচিয়ে মারে ফিলিস্তিন
আমার চোখগুলো চিবায় ফিলিস্তিন শিশু
ফিলিস্তিন আমার ডান দুঃখ
আমার বাম দুঃখ তার রক্তোৎপল মেঘ
আমি কবিতা লিখি ফিলিস্তিন
তাতে আমার দুঃখগুলো বাঁচে
রাতের তারায় দেখি ফিলিস্তিন নারীর
ভরাট স্তনের বোঁটায় গড়িয়ে পড়ে দুধ
পাশে বেহাত শিশুটি রক্তপায়ী মমি
ব্যান্ডেজে মুড়িয়ে বেহেস্তে যেতে থাকে

বেহেস্ত একটি রাজনৈতিক গোলক!
তার আবর্তনে ঘুমায় কত কত লোক
কেউ একজন শিশুটির প্রতি অনুসূয়া হোক

শান্তিদির বোন

কার ডাক কে ডাকে
তার নামে ফিঙে বসে
ডুমুরের শাখে

দৃশ্যে নেই, অদৃশ্যই
মূলত জড়িয়ে থাকে
শান্তিদির বোনকে

দেখা যায় না, কে তাকে
আমল করার ফাঁকে
বারোমাস মরতে থাকে (শালুক)

১৫ মার্চ ২০২৩, পলটন, ঢাকা

দুর্দান্ত কবিতা

আমার সাধারণ কথাগুলো কিন্তু দুর্দান্ত কবিতা
যদিও তোমরা বলছো এসব যা তা
মাকে নিয়ে হাসপাতালে যাই- এটি মানবিক কবিতা
বেতন না পেলেও ধারে বাসাভাড়া দেই- এটি রাজনৈতিক কবিতা
বন্ধু ফিরোজ বালিহাঁস পোষা ছেড়ে কৈশোরে জীবীকা নিতে করাচি গিয়েছিলো
শেষ বয়সে দেশে ফিরে দারোয়ানি করছে- এটি দেশপ্রেমের কবিতা
ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি দিতে না পেরে বউ পেটাচ্ছি- এটি প্রেমের কবিতা
মদের পার্টিতে ডাক না পেয়েও ইচ্ছা পুষেছি- এটি নৈর্বেক্তিক কবিতা
চাকরির খাদে পড়ে সম্পর্কগুলো দারু হয়ে গেছে- এটি জীবনমুখী কবিতা
গাছ বাঁচানোর আন্দোলন করা কিশোরীটি
গাছচাপায় মারা গেলো- এটি প্রকৃতির কবিতা
জীবন কেটে-ছিড়ে গেলেও রা করতে পারছি না- এটি স্বাধীনতার কবিতা

কবিতা আসলে কবিতা নয়
দিগ্বিদিক নিজেকে খোঁচানোর বেয়োনেট পুষে যাওয়া
যা তুমি আমল করছো দুর্দান্ত পবিত্রতায়

মার্চ ২০২৩, পল্টন, ঢাকা

ধনকুবেরের শিশ্নকাণ্ড

কুমারীভোগ বাতাস থেকে
রসগোল্লা চেয়ার পর্যন্ত যারা আহার করে

তাদের নয়া গণ্ডগোলে আমি অপেক্ষা করি
দেখি বিছানাচ্যুত মুনিয়ার ফোস্কাওঠা শ্বাস

নিভৃতে নেমে যাচ্ছে শসা দুন্দুলের আবাদ
পার হয়ে সোজা শঙ্কাতাতানো মাঠে
ধনকুবেরের মন্দাশিশ্ন গলতে থাকে তাতে

সাহানা

বর্ষায় ভেসে যাচ্ছে
সাহানার গর্ভমাস
শরীরের তোহম
গড়িয়ে নামছে
মনিরামপুর খালে

তাকায় না সাহানা
খবরও রাখে না
কত গর্ভ এলো-গেলো।
শত পিতৃপাথর
ঘষে গেলে দেহে
মৃদু বেদনা হয়
সেই বেদনাও মুখ্য নয়
টাকার রঙিলা মন্থনে
তাতেই কামড় বসেছে
কোভিড বর্ষণে

সাহানা এখন জলজা
ঘষায় ঘষায় খোসাওঠা বর্ষা

শ্রমিক

আমি সেই ফুল-পত্তর শ্রমিক
যার ঘ্রাণ ছড়ায় প্রেমিক
মাড়-ভাত নিরামিষে
সিনার রক্ত মিশে

তৈরি হয় জীবন
সেই জীবনের মাতৃভাষা- শ্রমিক
শ্রমিকের মাতৃভাষা- সংগ্রাম
সংগ্রামের মাতৃভাষা- মানুষ
আমি সেই মানুষ, যার মাতৃভাষা- ক্ষুধা

ক্ষুধাই মানুষের মৃত্যুসঙ্গী
জীবনের রঙ করা টিয়াপাখি

কবি ও রাজনীতি

থোকা থোকা জল, হাওয়ার বিরহ
বালিকার টেপা পুতুলের বিয়া
সবই রাজনীতি নিয়া
কবি কবিতা সঙ্গমের রীতি
কড়ায়-গণ্ডায় ধরা রাজনীতি
কেউ দ্যাখে, কেউ ঊষর কানা
ফেলে ফেলে কুড়ায় জীবনখানা
লালমোরগ, টেক্কাতুরুপ, মুদ্রা, ধুলো
ঠিক করতে হবে
তোমার রাজনীতি কোনগুলো
হয়তো মেঘ হলেও বৃষ্টি হলো না
হয়তো পাতা কুড়ানি, পক্ষি কেউ
গাছতলায় এলো না
তবুও ডালে ডালে হাওয়ার নড়া
বন্ধ থাকবে না
রাজনীতির গহিন ফেরারী গয়না
তোমার খাঁচায় পোষা জাল ময়না

সুগন্ধবিলাস

আগর গাছের দুঃখ থেকে সুগন্ধি হয়
তারে গায়ে মেখে তুমি সুখ পূরাও

দুঃখেরওতো পচন থাকে, উৎসে

তাকে টেনে নিয়ে ধরে রাখতে হয়
যেমন ঠনঠনে ডাল ধরে রাখে লালপলাশ
পাঁজরে বনাঞ্চল নিয়ে হাঁটে বানরের ঝাক

তারা কেউই বিলাসী নয়, অভিলাষী
নিজস্ব আলোয় চুপচাপ পিতৃত্ব
কতটা জেনেছো সুপ্ত অন্তর
কয়টা রুপেছো আগর নিজের ভেতর!

পুষ্প শুঁকে পুলক পাও
পুষ্প ফোটার অতসী সংগ্রাম দেখো না
এতে তোমার ফুল ছেঁড়ার আসুখ বাড়ে

হানা

ঘুরেফিরে সেই তারা
যারা বলে- তাদের শরীরে রক্ত
আর আমার শিরায় গাছের
ছাল-বাকল বইছে
চলনে আমি শিষ্টাচারকানা জঙলা

ঘুরেফিরে সেই তারা
যারা বলে- নদীর পোড়া
মাছ আমার দুইচোখ
আর আমি বৈয়ামে ভরা
মৌন গমের বিস্কুট-
নাগালে আসার আগেই শত্রু
হয়ে মুখে মুখে গলে যাই

ঘুরেফিরে সেই তারা
যাদের সত্যানন্দের চাবুক এসে
লাগে আমার বিহ্বল বিলে

যার সংক্রামক, মিথ্যা
উপাসনার চেয়ে আন্তরিক

ঘুরেফিরে সেই তারা
যারা প্রচুর শিক্ষা নিয়ে হয়ে গেছে
দুর্দান্ত বেবি পোষক

আমার বুনো ঘুমে হানা
দেয়াই তাদের ইবাদত

দুঃখসরোবর

আমার রচিত গালে আমার কবর
দীর্ঘ নিমজ্জনে আমরা দুই বন্ধুবর
নিম গাছের ফলিত ছোট ছোট ফল
মূলত নির্ঘুম সল্লায়ু ঋতুর কৌশল

যে শরীর আমি রচনা করে চলছি
ঘর-দোর ছাড়া ডাহুকের ভেতর
লগ্নের পর লগ্ন নারী মৌনতা যম
অমাজলে গিলে খেয়েছি পরস্পর

আমার রচিত গালে আমার কবর
গহিন ভরে খেলছে বালক পাথর
কোথাও হয়নি দেখা রূহের কবুতর
ভ্রমণ শেষে কে শোবে কার ভেতর

আমার রচিত গালে আমার কবর
মৃত্যুর পর পার হবো দুঃখসরোবর

বর্ষা দেখা

পাউরুটিতে বর্ষা লেগে গিয়ে
গাঙের দিকে ছুটতে থাকলো

ক্ষুধায় চুষে গাঙই খেয়ে নিলাম

আমাকেও পাউরুটি মনে হচ্ছে

কেউ এসে পাউরুটি খেয়ে নিলো
আমি তাকেও খেয়ে নিলাম

পাউরুটি চেপে বর্ষা দূর করলাম
কেউ গাঙ নিয়ে সরে পড়লো

আমি ঘুমের মধ্যে এসব দেখলাম!

করি দেহে গাছ চাষ, প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২২
প্রকাশক: বেহুলাবাংলা, প্রচ্ছদ: খন্দকার নাছির আহাম্মদ